প্রথম প্রকাশ/ফেব্রুয়ারী ১৯৬০
KABITAR NARI, A Collection of Poems
প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ মাজি, তারকেশ্বর, হুগলী
প্রচ্ছদচিত্র : কমল সাহা, কলিকাতা
মুদ্রক : তপন কর্মকার, জয়গুরু প্রেস, নালিকুল

কোন এক সুমনা নারীনবিত্তাকে

রূপাই সামন্তর কাব্যগ্রন্থ ঃ

প্রথম মুখ

ঘরে ভালোবাসার পাখি

ব্যথিত সময়

মুহূর্তের পাপড়ি

শুধু কবিতায় আছি

সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ঃ

বাংলা আমার বাংলাদেশ

আমি ফুল ভালোবাসি



রবীন্দ্রনাথ সামন্তর গবেষণাগ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রকাব্যে ফুল ॥ রবীন্দ্রনাথ ও নদী

শিল্পী মানুষ যামিনী রায়

ভুমুব্রত ও গীতি সমীক্ষা ॥ বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা

জীবনানন্দ প্রতিভা

নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন

নিবেদন

নিজের নারী, ঘরের নারী যখন হারিয়ে যায় তখনই বোধ হয় সময় আসে কবিতার নারীকে খোঁজ করার। এ রকম সময় আমাদের সবার জীবনেই আসে। আমরা কবিতার নারী অন্বেষণের কাজে হাত দিয়েছি, সময়ের হিসাবে, প্রায় ছ'বছর আগে। কবিতা আহরণ ও বাছাই করতে করতে প্রায় এক'শ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে এই অসম্পূর্ণ সংকলনে। কবিদের তালিকায় যেমন খ্যাত কবিরা আছেন, তেমনি অল্পখ্যাত কবিরাও আছেন। যাঁদের কবিতা আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ করতে পারিনি, তাঁদের কাছে আমাদের প্রচেষ্টা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবু বিনীত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

মূলতঃ তিনটি দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কবিতা বাছাই করেছি। ১ আমরা দেখতে চেয়েছি বাংলা কবিতায় কবে থেকে নায়িকার নাম উচ্চারণ করে কবিতা লেখার শুরু। ২ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে নারীর দেহরূপ বর্ণনায় যে অনুপুংখ ও সৌন্দর্যমুগ্ধ আগ্রহী বাস্তবতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা কবিতায় সেই ধারাটি কতখানি, কতদূর এবং কি ভাবে অনুসৃত হয়েছে। ৩ আর সেই ধরণের কবিতা গ্রহণ করেছি, যে সব কবিতায় এক এক ধরণের নারী মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে। যেমন জননী, অন্তঃসত্ত্বা জায়া, প্রিয়া, শিক্ষিকা, চাকুরিজীবিনী, বারাঙ্গনা, বিধবা, কিশোরী, ছাত্রী, আধুনিকা প্রভৃতি। এই নারীদের মধ্যে পরিচিত পৌরাণিক রমণীরাও আছেন। এই সংকলন নিছক প্রেমের কবিতার সংকলন নয়। প্রেম নয়, নারীই আমাদের প্রার্থিত বিষয়।

আমাদের সংকলনের ও প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন দেবকুমার বসু, রবীন সুর, লীলাময় মুখার্জী, বিদ্যুৎ ভৌমিক, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, অধ্যাপক বিজয় সিংহ, উত্তম দাশ, শিশুতোষ ধাওয়া প্রভৃতি বন্ধু, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী। পুস্তক বিপণির অনুপ মাহিন্দার এবং জয়গুরু প্রেসের মালিক ও কর্মীবৃন্দের সম্মিষ্ট সহযোগিতাও স্মরণীয়। নেপথ্যচারিণী আমার স্ত্রীর সাহায্য পেয়েছি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজে। সবাইকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বন্ধুত্ব জানাই।

কবিতার নারী

সূচিপত্র

১ সুতনুকা/?
২ শবরী/শবরপাদ
২ চণ্ডী/জয়দেব (অনু. রত্নেশ্বর হাজরা)
৪ ত্রিভুবনজনমোহিনী/বড়ু চণ্ডীদাস
৫ বয়ঃসন্ধির রাধা/বিদ্যাপতি
৭ কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা/বিদ্যাপতি
৭ বররঙ্গিনী/গোবিন্দদাস
৮ অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ/জগদানন্দ
৯ কোই নহি রাইক সমানা/শশিশেখর
১০ রাধারূপ/অনন্তদাস
১১ বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ/বাসুদেব ঘোষ
১২ সীতা/কৃত্তিবাস ওঝা
১৩ গৌরীর রূপ/কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
১৪ গোয়ালিনী বেশে মনসা/বিজয় গুপ্ত
১৫ সতী ময়না/দৌলত কাজি
১৭ পদ্মাবতী/আলাওল
১৯ দ্রৌপদীর রূপবর্ণন/কাশীরাম দাস
২২ দেবসভায় বেহুলা/ষষ্ঠীবর
২৩ বিদ্যার রূপবর্ণন/ভারতচন্দ্র রায়
২৪ অন্নদার মোহিনীরূপ/ভারতচন্দ্র রায়
২৫ ষোড়শী ভব-অঙ্গনা/মহাতব চাঁদ
২৬ নায়কের উক্তি/ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২৭ তিলোত্তমা/মধুসূদন দত্ত
৩০ প্রমীলা/মধুসূদন দত্ত
৩১ নিমন্ত্রণ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দরী কে/দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩৫
ওফিলিয়া/চিত্তরঞ্জন দাশ ৩৭
কিশোরী/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৭
মিলনোৎকণ্ঠা/মোহিতলাল মজুমদার ৩৯
সাঁওতাল যুবতী/কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪১
কলেজের মেয়ে/কালিদাস রায় ৪১
কবি-রাণী/নজরুল ইসলাম ৪৩
শ্যামলী/জীবনানন্দ দাশ ৪৩
সংশয়/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৪৪
তপোদৃশ্য/অমিয় চক্রবর্তী ৪৬
কুডানি/মনীশ ঘটক ৪৭
শকুন্তলা/প্রমথনাথ বিশী ৪৮
মৌটুসি/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৪৯
মুখরা/অপরাজিতা দেবী ৫১
সাঁওতাল মেয়ে/কানাই সামন্ত ৫২
একটি মেয়ে/অজিত দত্ত ৫৫
এলা-দি/বুদ্ধদেব বসু ৫৫
কিশোরী/মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
মন-দেওয়া-নেওয়া/বিষ্ণু দে ৫৯
একটি মেয়ে/সমর সেন ৬১
স্বর্ণিল/বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
সুদেষ্ণার জন্মদিন/কিরণশংকর সেনগুপ্ত ৬৩
বেশ্যা/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৫
আমার স্ত্রী/শুদ্ধসত্ত্ব বসু ৬৬
সুনন্দার দুঃখ/বটকৃষ্ণ দাস ৬৬
কতিপয় আমলার স্ত্রী/আবদুল গণি হাজারী ৬৭
রূপশালি মেয়ে/চারণকবি বৈদ্যনাথ ৬৯
পুনর্বাসন/সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৭২
মেজাজ/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৩
অন্তঃসত্ত্বা/কেদার ভাদুড়ী ৭৬
বিদিশা/রাজলক্ষ্মী দেবী ৭৭
মেয়ের চিঠি/বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮
পৌত্তলিক/অরবিন্দ গুহ ৭৯
কখনো এসে পড়ে যদি/গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০
বিশ্রান্তালাপ/শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় ৮১
অফিস ফেরৎ সেই তরুণীর উদ্দেশ্যে/ফণী বসু ৮২
নীরার হাসি ও অশ্রু/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮৩
হাসপাতাল/শঙ্খ ঘোষ ৮৪
জুলেখা ডবসন/শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৮৫

৮৬ সুধাদি/সুনীল মুখোপাধ্যায়
৮৬ আমি জোড় হাতে, ক্ষমা করো/দেবী রায়
৮৮ উদ্ধার/অমিতাভ দাশগুপ্ত
৮৯ পরী/রবীন সুর
৮৯ প্রসাধণরতা : কোণার্ক/রবীন আদক
৯০ মা/শামসুর রাহমান
৯১ একদা এক নদী/আল মাহমুদ
৯২ মধ্যপ্রাচ্য/আবুল হোসেন
৯৩ মণিমালা/রূপাই সামন্ত
৯৪ মণিমালার সংসার/সামসুল হক
৯৫ রুনু/উত্তম দাশ
৯৫ চেনা মুখ/অশ্বিনী কর
৯৬ রাণীর খোঁজে/বারীন ঘোষাল
৯৭ আথিনা এবং আমি/কমল তরফদার
৯৮ মাধবীর প্রতি/বিনোদ বেরা
৯৯ অমল হওয়া/ঈশ্বর ত্রিপাঠী
১০১ পলাতক সময়/কিরণ শংকর মৈত্র
১০২ কিশোরী/সুবো আচার্য
১০২ কাজল/কুশল মিত্র
১০৩ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী/সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
১০৪ সে নারী/কমল চক্রবর্তী
১০৫ কিশোরীর ফুল/দেবারতি মিত্র
১০৫ কার মুঠো খুলে পাওয়া/ব্রততী ঘোষরায়
১০৬ দীপাকে লেখা একটি চিঠি/মিনতি গোস্বামী
১০৮ তোতনের জন্য পদ্মমালা/অভিজিৎ ঘোষ
১১০ আমাদের রঞ্জনাদি/সুজিত সরকার
১১১ ভিকটোরিয়ায় নীলাঞ্জনা/নন্দদুলাল আচার্য
১১১ নির্বাচন/মিহির কুমার সেন
১১২ সেদিন তোমার দিদির বিয়ে/অমিয় কুমার সেনগুপ্ত
১১৩ কোলকাতার কবিতা সেন/অভিজিৎ পাত্র
১১৩ জলপাত্র হাতে সন্ন্যাসিনী/হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়
১১৫ প্রেম/রতনতনু ঘাটী
১১৬ বিধবা দিদি/নির্মল হালদার
১১৬ আমি আপনাকে চিনি না/সমীর রায়
১১৭ ইদানীং বনলতা সেন/জয়ন্ত দত্ত
১১৭ শোভনাকে/বিদ্যুৎ ভৌমিক
১১৮ সেই মেয়েটি/গৌরীশংকর গাঙ্গুলী
১১৯ বেশ তো লাগে/প্রবাল কুমার বসু
১২০ সুরঞ্জনাকে হাসতে দেখিনি কোনদিন/চন্দন চৌধুরী

বাংলা কবিতার নারী

[এক]

কী নামে ডেকে প্রিয়জনকে প্রিয় কথা বলবো, সেই সমস্যায় আমাদের সকলকেই পড়তে হয়। কখনো না কখনো। বাংলা কবিতায় সেই সমস্যা কোন কালে ছিল কি? চর্যাপদে অনেক নারী। কিন্তু তাদের নাম কেউ উচ্চারণ করেন নি। বৈষ্ণব পদাবলীর শতকরা নিরানব্বই ভাগ জুড়ে কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকার নামের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সেই উচ্চারণ আবেগ আজও থামেনি। কবিতার অলৌকিক বৃন্দাবন ছেড়ে সেই প্রিয় নাম বাস্তবের কোটি কোটি ভক্তের কণ্ঠে আজও উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি আর শুধু রাধা নন, শ্রীরাধিকা নন, তিনি আজ রাধা-ঠাকুরাণী, পরমাপ্রকৃতি। তাঁর ভাবদ্যুতিতে চৈতন্যদেব থেকে আরম্ভ করে কত ভক্ত সাধক, কত মধুরারসের রসিক স্তবলয়িত হয়ে উঠেছেন দেহে মনে আত্মায়। কানু ছাড়া গীত নেই, রাধা ছাড়াও আরাধনা নেই। উভয়তঃ বাংলার জনজীবনে ও বাংলার রসজীবনে—সাহিত্যে কাব্যে গানে নাটকে উপন্যাসে চারু ও কারু শিল্পকলায়। এই 'নামৈব কেবলম্'-এর যুগে মধ্যযুগের সাহিত্য-শাস্ত্র থেকে অন্য কোন রমণীকে এমন করে পাইনি। যদিও সীতার নাম পেয়েছি, দ্রৌপদীর নাম পেয়েছি, আমাদের দুই জাতীয় মহাকাব্য থেকে। সীতা কোন দিনই অলৌকিক জগতের মোহমায়ায় আবদ্ধ অধ্যাত্মলোকবাসিনী ছিলেন না বাঙালীর কাছে। কৃত্তিবাসের সীতা শাক্তপদাবলীর বা অন্নদামঙ্গলের উমার মতোই গ্রাম-বাংলার গৃহবধূ। আর আমি সীতাকে পেয়েছি এক জটিল মুহূর্তে, এক আশা নিরাশার ক্রান্তিলগ্নে। পড়ছিলাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ। লংকা-যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। বিভীষণের দৌত্যে সীতা অশোকবন থেকে সরাসরি আসছেন স্বামী সন্দর্শনে। পাল্‌কি থেকে নেমে তিনি পদব্রজে

চলেছেন। আবেগে সংশয়ে আনন্দে লজ্জায় সীতার চলার অপরূপ বর্ণনা আছে।[১] সীতাকে আমি এর আগে এমন করে দেখিনি। ঐ দেখার আনন্দে বিস্ময়ে আলোড়িত হয়েই আমি কবিতার নারী অন্বেষণের কাজ শুরু করি। সীতা আমাদের প্রিয় নাম নয়, আমাদের ঘরের মেয়ের নাম ক্বচিৎ রাখি সীতা। কিন্তু সীতা বড় পবিত্র নাম, চিরস্মরণীয় নাম। এই সংকলন সীতার নাম নিয়ে আরম্ভ আর 'মণিমালা'র নাম নিয়ে শেষ। মাঝখানে আছে আরও কতশত নারী।

দ্রৌপদী আমাদের প্রিয় নাম নয়, কিন্তু তিনিও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া। পঞ্চপাণ্ডবের তিনি জীবনমৃত্যুর সঙ্গিনী ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রিয় ছিলেন কি না জানি না। কারণ রাধাকে যেমন 'চণ্ডী' নামে স্মরণ করেছেন জয়দেবের কৃষ্ণ[২], রামও সীতাকে 'চণ্ডী' সম্বোধন করেছেন,[৩] তেমন কৌতুকময় প্রিয় নামে দ্রৌপদীকে কি সম্বোধন করেছেন পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কোন ভাই? করলেও, সে প্রিয় নামটি মহাভারতের চরণে চরণে শ্লোকে শ্লোকে খুঁজে বেড়াতে হয়। দ্রৌপদীর প্রিয় নামে বাঙালী কবিরা কোন স্বতন্ত্র কবিতা লেখেন নি। আসলে দ্রৌপদী আমাদের প্রিয় নারী নন, তিনি আমাদের মহানায়িকা। সীতার নামে বড় দুঃখ, আর দ্রৌপদীর নামে বড় দম্ভ। আমাদের ঘরের মেয়ের নামকরণ অনুষ্ঠানে এ দুটি নাম আমাদের তাই মনে পড়ে না।

মধ্যযুগের রাধা, সীতা, দ্রৌপদী, উমা প্রভৃতি পৌরাণিক নামমালার মধ্যে যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে যাই, তখন আমাদের বুকের ভিতরের সব

---

১ পৃঃ ১২, কবিতার নারী।

২ পৃঃ ২, কবিতার নারী।

৩ কালিদাসের কুমারসম্ভবেও 'চণ্ডী' সম্বোধন আছে, আছে অষ্টম সর্গের ৭১ শ্লোকে: "পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া জ্যোৎস্নয়া জনিতরূপ সংশয়ম্। মারুতে চলতি চণ্ডি! কেবলং ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্তমংশুকম্।" পার্বতীকে চণ্ডী সম্বোধন করেছেন মিলনপিপাসু মহাদেব॥

কটি নিভৃতনিবাসী তন্ত্রী একযোগে কেঁপে ওঠে। বিষ্ণুপ্রিয়া বাস্তবের নারী, আমাদের ঘরের রমণী। খুঁজে খুঁজে নবদ্বীপের সেই পরিচিত শূন্য পাড়াটিতে গেলে যেন এখনও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখতে পাওয়া যাবে। শূন্য ঘরের নিকোনো দাওয়ায় বসে তিনি সন্ন্যাসী স্বামীর জন্য এখনও যেন অপেক্ষা করছেন। কৃত্তিবাস সীতাকে পুরাণের প্রাচীনত্ব থেকে নামিয়ে এনে বাঙালী গৃহবধূর আসনে বসিয়েছেন। রাধাও হয়তো কোন কোন অংশে বঙ্গনারী হয়ে উঠেছেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো কান্না আর কে কেঁদেছে! মহান স্বামীর মহান ত্যাগব্রতের নেপথ্যে এমনি করেই বুঝি বুদ্ধদেবের গোপা-যশোধরা আর শ্রীঅরবিন্দের মৃণালিনী কেঁদেছেন। কিন্তু তাঁদের কান্নার খবর আমরা কজন রাখি? কবিরাও তাঁদের কান্নার ভাষা বয়ন করেননি সুরে ছন্দে। বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না আর বিরহিনী রাধার কান্নায় কত তফাৎ!

নিজ নারীকে প্রিয় নামে ডাকার প্রবণতা সমগ্র আদি ও মধ্যযুগে দেখা দেয়নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা, ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণনায় চরিত্র-রচনায় কোন্ বাস্তব বিশ্বের কিশোরী বা যুবতী কন্যা ছিল, সে সৎ সংবাদ পাওয়ার কোন উপায় আমাদের নেই। এমন কি আধুনিক যুগের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, মোহিতলাল প্রভৃতি কবিদের নিজ নিজ প্রেয়সী নারীদের নাম আমরা জানি না। এঁরা নারীকে ভালো বাসলেন, নারীর কাছে অমৃতবিন্দু ভালোবাসা চাইলেন, কিন্তু কবিতায় তাদের নাম উচ্চারণ করলেন না। সবই রাখলেন মায়া ও ছায়ার আড়ালে। কাব্যের মায়া আর অনুচ্চারণের অনভ্যাসের ছায়া। সেকাল ছিল নারীর অবগুণ্ঠনের কাল। বাস্তব নারীর অবগুণ্ঠনের যুগে কবিতার নারীও রয়ে গেলেন নামহীন নেপথ্যে। বিহারীলালের নারীরা কখনো অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী, কখনো রহস্যময়ী সারদা। দ্বিজগতের এই রকম তত্ত্বস্বরূপ ও বস্তুরূপ ভেদ করে রবীন্দ্রনাথে নাম উচ্চারণের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল একেবারে নামজপের মতো। বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়

পড়লেই বোঝা যায় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ভরিয়ে তুলতেন নিভৃত ও বেদনাশুদ্ধ হৃদয় ও মন, স্মৃতি ও চেতনা প্রেয়সী নারীর নাম-স্মরণে ও উচ্চারণে। কবিকাহিনীতে নলিনী নাম উচ্চারণ প্রিয়তায় মণ্ডিত, ভগ্নহৃদয়ে ঐ একই নলিনী নাম পরিণত হয়েছে জপমন্ত্রে—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি শুনেছি তাহা।
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা।
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম!
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম!

উদ্ধৃত অংশটি ভগ্নহৃদয় কাব্যের চতুর্থ সর্গের অষ্টমগান। কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এই নাম জপের মধ্যে কিশোর কবির কিশোরী বান্ধবী আন্না তরখড়ের স্মৃতি গোপন নেই। কবি আন্নাকে ডাকতেন 'নলিনী' বলে। নামপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নিবন্ধে লিখেছিলেন—

"নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়া গেছেন, গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেক-গুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে।"

সংস্কৃত সাহিত্য নাম-সৌন্দর্যে সুন্দর। বাংলা সাহিত্য কি এমন করে নাম-সৌন্দর্যে সুন্দর হতে পেরেছে? বাংলা সাহিত্যের নায়ক নায়িকার নাম সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই মূলতঃ নেওয়া। বাঙালী ছেলেমেয়েদের নামের জন্যও আমরা ঋণী সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে। তবে ইদানীং কিছু বিদেশী নাম কেটি, মিলি, পামেলা, লিলিনা, কৃষ্টিনা, মেরি, যীশু, প্যাট্রিক, টম প্রভৃতি আমাদের সমাজে চল হচ্ছে। সংস্কৃত নাম সাধারণতঃ বিশেষণ মূলক। প্রিয়ংবদা, অনসূয়া থেকেই আমরা চারুহাসিনী, মৃদুভাষিণী, প্রভাবতী প্রভৃতি নাম পেয়েছি। পার্থ, যাজ্ঞসেনী, শকুন্তলা প্রভৃতি নামে বিশেষণের অতিরিক্ত কিছু আছে। এই ধরণের উৎস-নির্দেশী নামের রেওয়াজ আজ লুপ্ত হয়ে গেছে উভয়তঃ বঙ্গ সমাজে ও বঙ্গ সাহিত্যে। রবিলোচন, অমূল্যরতন, হৈমবতী, শ্রাবণী প্রভৃতি নাম আজও আছে। কিন্তু গীতগোবিন্দমের দ্বাদশটি সর্গে কৃষ্ণকে যেমন অনুপ্রাসছন্দিত দ্বাদশটি নামে[1] ডাকা হয়েছে, তেমনটি আজ আর চল নেই।

প্রাচীন সাহিত্য পর্যালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ ঐ যে বক্তব্য রেখেছেন, নামপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দানে তা সক্ষম হলেও জানি ঐ উক্তিতে কল্পনাশ্রিত অথবা পুরাণাশ্রিত নামমালার জন্যই কবিত্বময় আক্ষেপ বা আনন্দ বিলাস। বাস্তব নারীকে বাস্তব নামে রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় তেমন করে ডাকতে পারলেন না। তাঁর 'কৃষ্ণকলি' যেমন কবিত্বে ঢাকা কোন কালো মেয়েকে ইঙ্গিত করে, তেমনি তাঁর 'ছবি' কবিতার বাস্তব নারীও ইঙ্গিতময় হয়েই রইলো। 'শ্যামা' কবিতায়—'তার পরে একদিন/ জানাশোনা হল বাধাহীন।/ একদিন নিয়ে তার ডাকনাম/তারে ডাকিলাম।' কিন্তু কি নামে ডেকেছিলেন তা আমরা জানতে পারি নি।

১ সামোদ-দামোদর, অক্লেশ-কেশব, মুগ্ধ-মধুসূদন, স্নিগ্ধ-মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরী-কাক্ষ, ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ, নাগর-নারায়ণ, বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ-মুকুন্দ, মুগ্ধ-মাধব, সানন্দ-গোবিন্দ, সুপ্রীত-পীতাম্বর॥

'নিমন্ত্রণ'[১] কবিতাটিতেও সেই সচেতন গোপনীয়তা। 'একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম'—একথা জেনেও কবি গোপন করলেন তাঁর প্রেয়সী নারীর নাম। আর 'মহুয়া' কাব্যের 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে যে সব নারীর নাম উচ্চারিত হয়েছে তারা যতখানি চারিত্রধর্মের নামানুসারিণী ঠিক ততখানি প্রিয় নামের নাম্নী নয়। আর চেষ্টাকৃত ঐ সব নাম চয়ন রবীন্দ্রনাথের নামপ্রেমিকতাকে যেন ছোট করে দিয়েছে। নাম দিয়েই নাম্নীকে চেনাতে চেয়েছেন তিনি। সংস্কৃত রতিশাস্ত্রে বা অলংকারশাস্ত্রে এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। শংখিনী, পদ্মিনী, হস্তিনী বা ধীরোদাত্ত, ধীরললিত প্রভৃতি মানব মানবী বিভাগে যতখানি বিশ্লেষণী পাণ্ডিত্য আছে ততখানি বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় নেই। তাহলেও নারীর মূল চারটি ভাগের[২] মধ্যে নারীকে তবু আলাদা আলাদা ভাবে ধরা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রকৃত সতেরটি ভাগের মধ্যে নারীর পৃথক সত্তা সত্যই পৃথক থাকেনি। এর থেকে, তিনি নারীর যে দুই ভাগ করেছেন—লক্ষ্মী ও উর্বশী (মাতা ও প্রেয়সী)—তা অনেক বেশি গ্রহণীয়। 'নাম্নী' কবিতার মতো এমন কৃত্রিম নাম ও এমন কৃত্রিম নারী কবিতা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্যত্র নেই। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দিতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ, নারীকে দুটি প্রকৃতি সত্তায় রূপাবয়বে ভাগ করে লক্ষ্মী ও উর্বশী নামে চিনেছেন চিনিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ, যে রবীন্দ্রনাথ গল্পে উপন্যাসে নাটকে কবিতায় প্রায় তিন শতাধিক নারীর নাম গ্রন্থনায় নিয়োজিত হয়েছেন, যিনি নবজাতকের নামকরণে সবিশেষ আগ্রহী ও পটু ছিলেন,[৩] তিনি যখন 'নাম্নী' কবিতার নায়িকাদের নাম দেন, তখন বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন। কবিতাগুলির ব্যর্থতার জন্যই কিনা জানি না, বাঙালীদের কাছে নামগুলি প্রিয় হয়নি, কন্যাদের নামকরণে

১ পৃঃ ৩১, কবিতার নারী।

২ পদ্মিনী, শংখিনী, চিত্রানী ও হস্তিনী।

৩ যেমন একটি শিশুকন্যার নাম রেখেছিলেন 'সেবন্তী'। সেবন্তী হচ্ছে শাদা গোলাপ সেঁউতি।

ঐ নামগুলির মধ্যে দু'একটি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। প্রতিমা, নন্দিনী, কাকলী, কাজলী প্রভৃতি নাম নিশ্চয়ই 'নাম্নী' কবিতার জন্ম প্রিয়তা লাভ করেনি।

বিচিত্র নামে ডেকে বিভিন্ন নারীকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। তাঁর 'চিঠি' অথবা 'পত্রগুচ্ছ' নামক কবিতাগুচ্ছ ঠিক মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিতার মতো নয়। পৌরাণিক নারীদের মধুসূদন অনেক নিকট করে তুলেছেন, কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের নারীরা সর্বাংশে নিকটের নারী। 'চিঠি' কাব্যে অমিয়কুমার, নন্দদুলাল, ভবানী প্রভৃতি নায়ককে পত্র-কবিতাগুচ্ছ লিখিত হয়েছে। আর 'পত্রগুচ্ছ' কাব্যে রচিত হয়েছে নায়িকাদের নাম ধরে ধরে কবিতাগুচ্ছ। যেমন স্বাতী, বাসন্তী, শ্যামশ্রী, গৌরী, সীমা, মৌটুসি, বিজলী প্রভৃতিদের নামে এক একটি কবিতা। এমনি অনেকগুলি কবিতা। পত্রগুচ্ছের কবিতাবলী স্নেহভাজন, পরিচিত ও আত্মীয়দের নিকট লিখিত। এই-খানেই 'নাম্নী' কবিতা গুচ্ছের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পত্রগুচ্ছ' কবিতার অচিন্ত্যকুমারের পার্থক্য। অচিন্ত্যকুমারের পরেই তাই আসে জীবনানন্দের বনলতা সেনের যুগ, সুনীলের নীরাব যুগ।

এবং এই বিবর্তন বাংলা কাব্যে থেমে যায়নি। 'কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে'—এই স্বভাবজ প্রিয়প্রাণতা রবীন্দ্রনাথের 'নাম্নী' কবিতায় নেই। যদিও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিপুণ এবং মহাকবি। বিশ্লেষণের দক্ষ নিপুণতা সেখানে আছে, আছে চমক বা চমৎকারিত্ব। কিন্তু চমৎকারিত্বের পরেও যে সত্য ও সুখ তার অভাব আছে তাদের নামে। সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি যুগের প্রেয়সী নারীকে 'জীবনদেবতা' সম্বোধন করে যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রিয় পরিচিত নাম উচ্চারণের আনন্দকে এড়িয়ে গেছেন তেমনি 'নাম্নী' কবিতার সতেরটি নামের[১] সতের রকম উচ্চারণেও পরিচিত

১ শ্যামলী, কাজলী, হেঁয়ালী, খেয়ালী, কাকলী, পিয়ালী, দিয়ালী, নাগরী, সাগরী, জয়ন্তী, ঝামরী, যুবতি, মালিনী, করুণী, প্রতিমা, নন্দিনী, উষসী ॥

নামকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। হেঁয়ালি, খেয়ালী, দিয়ালী, নাগরী, ঝামরী প্রভৃতি আর যাই হোক ভালো নাম নয়। আর মুরতি ও প্রতিমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

অজিত দত্তের মালতীকে নিয়ে সুখকল্পনার স্মৃতি সবারই মনে আছে।[১] কোন একটি নামের প্রতি এ যুগের কবির আগ্রহ যে কত অধিক তার প্রমাণ শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নয়, আরও একাধিক প্রমাণ কবি সামসুল হক অথবা উত্তম দাশ। সামসুল হক-এর 'ডায়েরী' নামক কাব্যের দুটি অংশ। তার প্রথম অংশ 'স্মৃতির সমুদ্রে স্বপ্ন'-এ আছে ত্রিশটি কবিতা। প্রতিটি কবিতাতেই এক বা একাধিকবার একটি নাম উচ্চারিত হয়েছে। সে নামটি হচ্ছে 'রাণী'। একজন মুসলমান কবির কণ্ঠে এই নাম, হিন্দু নারীর নাম, বারবার উচ্চারিত হবার ফলে পাঠক মনে যে বিস্ময়রসের উদ্ভাবনা ঘটে তার তুলনা নেই। 'রুণু'কে নিয়ে লেখা একগুচ্ছ কবিতার সুচিত্রিত[২] একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন উত্তম দাশ ১৯৮৩ সালের 'বইমেলা' উপলক্ষে। আড়ম্বরহীন মৃদু স্বরে নায়িকার নামটি উচ্চারিত হলেও বাস্তবের রমণীকে খুব নিকট থেকে চিনিয়ে দেয় কবিতাগুলি। রবীন্দ্রনাথেব নলিনী, সুনীলের নীরা, সামসুলের রাণী, রূপাইয়ের মণিমালা, উত্তমের রুণু প্রভৃতি নামের সঙ্গে দেহ মন হৃদয় আর কত না বিরহ মিলনের স্মৃতি জড়িত আছে। কখনো বা লী হাণ্টের জেনির[৩] মতো ভাঙা

ভাগ্যের উপর আলোক শিখার মতো উজ্জ্বল থাকে কোনও একটি নাম। হয়তো জেনিরা তা জানতেও পারে না। জেনিরা হয়তো ভুলে যায় কবে কোন্ নির্জনতায় চুম্বনের প্রথম স্পর্শ দিয়েছিল কোন্ পুরুষের ওষ্ঠে, ভুলে যায় কোন্ পুরুষ কখন ডেকেছিল আনন্দিত গুঞ্জনে কোন এক সচেতনচয়িত মিষ্টি নামে। কিন্তু কবিরা ভোলেন না। তাইতো কবিতায় কবিতায় তাদেরই সোহাগসুন্দর স্মৃতির সাক্ষর, কবিতায় কবিতায় তাদেরই নামামৃত।

সংকলনের সময় রবীন্দ্রনাথের 'নিমন্ত্রণ' কবিতার নায়িকার নাম যেমন জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, তেমনি জানতে ইচ্ছা হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুন্দরী কে' অথবা সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী,' নজরুলের 'কবি-রাণী', মোহিতলালের 'মিলনোৎকণ্ঠা' প্রভৃতি কবিতার নায়িকাদের নাম।[১] সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তারপরেই এলো সেই ইচ্ছাপূরণের কাল। হাজার বছরের কল্পলোক পার হয়ে পেলাম জীবনানন্দের বনলতা সেনকে। নাটোরের বনলতা। বনলতা !! ভারি ছন্দোময় মিষ্টি নাম। মেয়েটির গায়ের রঙের কথা কবি বলেন নি, যদিও মুখের কারু, চুলের রঙ, চোখের ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন। তার কণ্ঠস্বরও শুনেছি।

বনলতা—তাই মনে হয়েছে তার গায়ের রঙ বনের লতার মতো শ্যামলাভ কালো। তারপরেই তাই যেন তাকে ডেকেছেন 'শ্যামলী' নামে এবং একটি স্বতন্ত্র কবিতা লিখেছেন।[২] 'সেন' উপাধি শুদ্ধ নামটি জেনে, আমাদের কাছে জীবনানন্দের নায়িকা হল অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক বেশি আপন! তবু যেন কিছু রোমান্সের আভা রয়ে গেল—শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সুদর্শনা প্রভৃতি নারীনামের সঙ্গে। মৃণালিনী ঘোষাল, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস প্রভৃতি নারী নামে উপাধি যোগ

করে জীবনানন্দ আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের, শহুরে ও পাড়াগাঁয়ে রমণীদের সম্বন্ধে সজাগ করে তুললেন। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী বা এলা-দিও আমাদের খুব পরিচিত। অতিকথনের ঝড়ের মধ্য থেকে কঙ্কাবতীকে চিনে নিতে যেমন অসুবিধা হয় না, তেমনি আভিজাত্যের পর্দার ওপারে শুয়ে বসে থাকা এলা-দিকেও[১] দেখে নিতে পেরেছি সহজে। আর অতিপরিচয়ের নিবিড় আবেগ জড়িয়ে আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরাকে ঘিরে। একই নামের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ একই কবির কবিতায়—অসংখ্য কবিতায় এমন করে পূর্বে ঘটেনি।[২] বনলতা সেন আর নীরা—আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি খুঁজে দেখতে চাইলাম, নারীর নাম উচ্চারণ করে বাংলা কবিতা লেখার সূচনা কবে থেকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বাংলা ভাষার জন্মপ্রস্তুতি যখন চলছে, সেই অতীত যুগের শিলালিপিতে যে তিন ছত্রের কবিতা উৎকীর্ণ হয়েছিল, সেখানেই ঘটেছে নায়িকার প্রথম নাম উচ্চারণ। নামটি 'সুতনুকা'। বাংলা কবিতার প্রথম নারীনাম, প্রিয় নাম, প্রেয়সীর নাম। উত্তরপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ের উপরে যোগীমারা নামক গুহায় খোদিত এই লিপিটির শব্দ ও অক্ষর বৈশিষ্ট্য মাগধী প্রাকৃতের অনুগামী। মাগধী প্রাকৃত থেকে আদি বাংলা ভাষার অবস্থান খুব একটা দূরের ব্যাপার নয়।[৩] "সুতনুকা নামে কোন এক দেবদাসী বারাণসীর দেবদত্ত নামে এক শিল্পীকে ভালোবেসেছিল।"[৪] এই সংবাদ অবশ্য বলে না দেবদত্ত আমাদের সুতনুকাকে ভালোবেসেছিল কি না। তবু আমাদের ধীর বিশ্বাস, এত সুন্দর নাম যার, সেই সুতনুকাকে ভালো না বেসে দেবদত্ত পারেনি। সুতনুকা যেমন সুন্দর নাম, এমন সুন্দর নাম আমাদের সংকলিত

কবিতাগুলির মধ্যে আরও আছে। যেমন—কুড়ানি, মৌটুসি, ডলু, স্বর্ণা, সুদেষ্ণা, সুনন্দা, সুমন, সুষমা, বিদিশা, গৌরী, সুধা, বনশ্রী, নীহারবালা, মণিমালা, রুনু, মাধবী, রূপা, কাজল, দীপা, তোতন (রত্নাবলী), রঞ্জনা, রুমা, কবিতা, নীলাঞ্জনা, শোভনা, রীণা, কৃষ্ণা, শ্যামলী এবং নীরা প্রভৃতি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীতে যে সব নায়িকা, বান্ধবী, প্রেয়সীর আনাগোনা ঘটেছিল, আমি অতীতে মন ফিরিয়ে দেখলাম, ঐ সব নামের মধ্যে অনেকেই আমার প্রিয়নাম। এদের অনেকের কাছেই প্রীতি বা বন্ধুতার অমৃতকণা প্রার্থনা করেছিলাম। আপনাদের অতীত-বর্তমানের সুখ দুঃখের পাতা উল্টে দেখলে আপনারাও এমনি সব প্রিয় পরিচিত নাম খুঁজে পাবেন, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের সহস্র কাব্যে কবিতায়। আমি জানি, এই সব নামের মধ্যে আধুনিক আধুনিকতম কবিরা কেউ কেউ সরাসরি নিজের নারীর নাম উচ্চারণ করেছেন, কেউ বা প্রিয় নামের ছদ্মবেশে, ডাকনামের ঘন আবেশে, প্রকৃত নাম চাপা দিয়েছেন। এই ভাবেই নারীনাম নিয়ে কবিতায় কবিতায় অতিরিক্ত এক কাব্যময়তার আভাস জেগেছে।

স্বদেশিনীদের পাশাপাশি কেউ বা বিদেশিনীদের নাম চয়ন করেছেন। চিত্তরঞ্জনের 'ওফেলিয়ার'[১] অনুসরণে না হলেও রবীন্দ্রনাথের 'হে বিদেশী ফুল'-এর অনুষঙ্গে। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জুলেখা ডবসন, কমল তরফদারের আথিনা প্রভৃতি। বিদেশিনীরাও আর বাঙালী কবিদের কাছে দূরবর্তিনী নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো 'বিজয়া' নামের আড়াল রচনা করতে হয় না তাঁদের।[২] রাধা, সীতা, উমা, শ্যামলী, নীরা, সুমনাদের জন্য বিমুগ্ধপ্রাণ কবিরা যখন মেরী, মার্গারেট, নাতাশা,

পলিনাদের জন্য কবিতা রচনা করেন তখন বাংলা কবিতার বাঙালী নারীদের চোখে বাঁকা কৌতুকের বা চাপা ঈর্ষার শিখা কাঁপে কি না কে জানে!

[দুই]

নারীর রূপবর্ণনা কেমন করে করতে হয়, বাঙালী কবিরা তা জানতেন না। নিজের নারীকে নিজের মতো করে দেখার সৌন্দর্যবোধ তাঁদের ছিল না। তাঁরা অনুসরণ করেছেন সংস্কৃত কবিদের নারীরূপবর্ণনার রীতি। ঐতিহ্য নিশ্চয়ই অবধারিত, কিন্তু ঐতিহ্য কখনও কখনও সজীব সচেতন মানুষকেও অন্ধ করে দেয়, অন্ধ করে রাখে। মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের পক্ষে যেমন এই অভিজ্ঞতা সত্য, তেমনি সত্য আধুনিক কবিদেরও পক্ষে। বৈষ্ণব পদাবলীর বিদ্যাপতি, মঙ্গলকাব্যের ভারতচন্দ্র—উভয়ের আবির্ভাব কালের ব্যবধান কয়েক শতাব্দী, কিন্তু মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের বিশেষ তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু এই—বিদ্যাপতি বালিকাবয়সী কন্যার কিশোরীবয়সী হবার সময়কালের দেহবৈচিত্র্যের বিবরণ দিতে ভালোবাসতেন। ভারতচন্দ্র ভালোবাসতেন নারীর পূর্ণায়ত যুবতীধরণের দেহরূপ দর্শন করতে ও দর্শন করাতে। সে নারী দেবীই হন, আর মানবীই হন। এমন কি শাক্ত পদকর্তাদের ভক্তি ঢুলুঢুলু চক্ষে শ্যামা মায়ের যে রূপ ধরা পড়েছে তা পাঠ করতে আমাদের লজ্জা করে।[১] সাধককবি রামপ্রসাদ যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন, সেই নগ্ন সত্য হজম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মধ্যযুগের রাজসভাসেবী বা স্বতন্ত্র মুসলমান কবিরাও নারীরূপের মোহ অতিক্রম করতে চাননি এবং সংস্কৃত কাব্যের শিক্ষাটিকেই আরও অতিশয়োক্তি মণ্ডিত করে নিয়েছিলেন।

১ পৃঃ ২৫, কবিতার নারী।

কেন এমন ঘটতো বা ঘটেছিল? ঘটেছিল ঐতিহ্যের অভ্যাসগত অনুকরণের ফলে। নারীর মধ্যে অতিজাগতিক রূপের ঘনীভূত বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ আবিষ্কার করার মনোভাব গোটে, শেলী, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁদের অর্থাৎ সংস্কৃত কবিদের ছিল না। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যে ও সংস্কৃত সাহিত্যে নারী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল 'ভোগ্যা'। হীন অর্থে নয়, প্রগাঢ় আনন্দ ও বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার অর্থে। এর সঙ্গে গ্রীসীয় ভোগবাদের মিল আছে কিন্তু কতখানি আছে জানি না। উভয় দেশের ভাস্কর্যনিদর্শনে ঐ ঐকান্তিক ভোগবাদ অপূর্ব নান্দনিক সত্তা লাভ করেছে দেখতে পাই। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—তাই ভার্যাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হত। তার পীবর স্তনভাণ্ডে, সুবলয়িত জঙ্ঘা ও সুগঠিত নিতম্বে সেই যৌবনপ্রাচুর্য কাম্য ছিল, যে যৌবনপ্রাচুর্য শুধু কান্ত বা দয়িতকে সুখী করে তাই নয়, সন্তানকেও জন্মক্ষণ থেকেই সুস্থ সবল সৌন্দর্য দান করতে পারে। এই পরিপূর্ণ যৌবনপূজা যেমন মন্দিরতোরণে বা প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে কলসীকক্ষে নারীরূপে দেখা দিত তেমনি দেখা দিয়েছে মিথুন-মূর্তিতে কোণার্কে, খাজুরাহো ও বাঘ গুহার প্রস্তরীভূত মহাকাব্যে। এই ভোগ্যা নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কিছু দেখা গেছে বিদেশের শিল্পী রুবেন্স[1] ও রেনোয়ার এবং স্বদেশের শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের যৌবনবতী চিত্রাবলীতে[2]। অর্থাৎ নারীকে পূর্ণযৌবনা রূপে দেখার দৃষ্টি এই রোমান্টিক বা রিয়ালিস্টিক যুগেও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি।

এবং ভোগবাদের বিকৃতির সম্ভাবনা অনেক বেশী। শুদ্ধ, শান্ত, রুচিশীল ভোগবাদ রক্ষা করাও খুব কঠিন। সংস্কৃত সাহিত্যে সেই বিকৃতি দেখা গেছে। আর একই বর্ণনাভঙ্গির পুনঃপুনঃ ব্যবহারও হয়ে উঠেছে

অহঙ্কারজনক। সংস্কৃত কাব্যে নাটকে নারীকে রূপে রূপে রূপময়ী করে দেখা ও দেখানোর মধ্যে যে ক্লাসিক মনোভঙ্গি ছিল, যে কামঘন তন্ময়তা ছিল, রিরংসাউদ্রেকী যে অভিসন্ধি ছিল, তার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বাঙালী কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙালী কবিরা যখন সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন তখনও নারীর স্তন, জংঘা, নিতম্ব, কটিদেশ, পদদণ্ড, বাহুলতা, অধরওষ্ঠ প্রভৃতি নিয়ে একই প্রথায় বাড়াবাড়ি বর্ণনা করেছেন। জয়দেব কান্তকোমল পদে যে নারীকে দেখালেন, তিনি শ্রীরাধিকা এবং তিনি হরিস্মরণের ভক্তিতীর্থে অবস্থান না করে স্মরগরলের ভোগবিশ্বে বিচরণ করেছেন। জয়দেবের স্বল্পপরিসর কাব্য গীতগোবিন্দম্-এ কতবার 'স্তন' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান গ্রহণ করলেই বোঝা যাবে জয়দেব অলৌকিক বৃন্দাবন রচনা করেননি, রচনা করেছেন গরীয়সী নারীর সঙ্গে অত্যন্ত পটু নায়কের মিলনকাব্য। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আমরা জানি। জানি বিশেষণ শব্দ ও বিশেষণ বাক্য রচনায় সংস্কৃত কবিরা বিশেষ আগ্রহী ও সবিশেষ পারঙ্গম। সেগুলি হয়তো মহান কিন্তু সব সময় অধ্যাত্ম ভাবভারাতুর নয়। কিন্তু বিশেষণদক্ষ জয়দেব যখন বলেন 'পীনপয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চলকরযুগশালি' কৃষ্ণের কথা, তখন সেই কৃষ্ণ নারীদেহলোভী মিলনপ্রিয় নায়ক ছাড়া আর কি! ভবভূতি মাঘ ভারবি কালিদাস প্রভৃতি কবিদের রচনার সঙ্গে গাথা-সপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল[*] প্রভৃতি গীতিশ্লোকের নমুনা অনুধাবন করলে বুঝতে পারি বাঙালী কবিদের শিক্ষা সমুচিত হয়েছিল এবং সে শিক্ষার বেগবান ধারা স্রোত থেকে মধুসূদন এমনকি সুধীন্দ্রনাথও উঠে আসতে পারেননি। অথচ এঁরা উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর 'আধুনিক' কবিচূড়ামণিদের মধ্যে সবিশেষ স্মরণীয় এবং এঁরাই নাকি নতুন যুগের নতুন কাব্যধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন!

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা কি পাই? নারীকে রূপে রূপে রূপময়ী

[*] সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত ভাষায় লেখা, কিন্তু রূপরীতি একই

করে রচনা করার প্রয়াস দেখতে পাই। সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে দেহসৌন্দর্যের দিক থেকে কোন নারী রূপহীনা বা কুরূপা নয়। শস্যশালিনী ভূমিক্ষেত্রের মতো, তরঙ্গশালিনী নদীমালার মতো নারী সেখানে উর্বরা, নারী সেখানে প্রবল মোহসঞ্চারিণী। অবশ্য সংস্কৃত কবিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক সময় সৎ ছিলেন। সততার অভাব ঘটেছিল বাংলা কবিদের ক্ষেত্রে। ব্যতিক্রম যে কিছু ছিল না তা নয়। কিন্তু ক্বচিৎ ব্যতিক্রম, অনেক বড় করে চিনে নিতে সাহায্য করে, স্বভাবদুষ্ট ও যুক্তি-চেতনাহীন অনুকরণ প্রবৃত্তিকেই।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মূলতঃ ধর্মকাব্য। এখানে দর্শনচিন্তা ও তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে কাব্যসৌন্দর্য সুবিন্যাস পেয়েছে। কিন্তু এখানেও সুযোগ যখন ঘটেছে তখনই নারীকে দেহগত ভাবে দেখে নিতে সংকোচ ঘটেনি। বিলাপ বেদনার মধ্যেও স্থূল রূপদৃষ্টি ব্যাহত হয়নি। এই কাব্যের অষ্টম সর্গে সারথি ছন্দক যখন রাজপুরীতে ফিরে এলো তখন পুরবাসীরা রাজপুত্র গৌতমকে না দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। এই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্যের চিত্ররচনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"অন্য নারীরা বিষাদে যেন অচেতন, তাঁদের হাত ও কাঁধ ঝুলে পড়েছে ; তাঁরা উচ্চ কণ্ঠে কাঁদলেন না, চোখের জলও ফেললেন না, দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না। তাঁরা না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—মনে হল তাঁরা চিত্রাংকিত। পর্বত যেমন প্রস্রবনের দ্বারা প্রস্তর খণ্ডগুলি সিক্ত করে, তেমনি পতিশোক মূর্ছিত অন্য রমণীরা তাঁদের চন্দনরহিত স্তন অধীরভাবে সিঞ্চিত করতে লাগলেন ---নয়ন তাঁদের প্রস্রবন আর স্তনরাজি প্রস্তরখণ্ড। অশ্রু সলিলে প্লাবিত কতকগুলি মুখ! যেন রাজভবন একটি সরোবর ; সরোবরে ফুটে আছে নবীন বর্ষায় বর্ষণসিক্ত জলস্রাবী কতক-গুলি পদ্ম। বরাঙ্গনাগণ তাঁদের পদ্মের মতো কোমল হাতে বক্ষে আঘাত করতে লাগলেন—তাঁদের হাতের আঙুল সুগোল, পুষ্ট,

ঘন, অলংকারহীন এবং গূঢ় শিরাযুক্ত। সেই নারীদের ঘন উন্নত স্তন করপ্রহারে চঞ্চল—যেন নদীবক্ষ চক্রবাক মিথুনে শোভিত—সেই মিথুন বনবায়ুতে ঘূর্ণিত পদ্মের দ্বারা কম্পিত। তাঁরা যেমন হস্তের দ্বারা বক্ষ পীড়িত করলেন, তেমনি বক্ষের দ্বারা হস্তও পীড়িত করলেন। অবলাগণ অকরুণ হয়ে করাগ্র এবং বক্ষের দ্বারা পরস্পরের ব্যথা উৎপাদন করলেন।[১]

মনে রাখতে হবে, এই দীর্ঘ উক্তি রাজবাড়ীর শোকদৃশ্যের বর্ণনা। কিন্তু শোকের গভীর স্পর্শ নয়, নারীবক্ষের স্পর্শমাধুরী উদ্বেলিত হতে চেয়েছে এই বর্ণনায়। সংস্কৃত কবিরা কি স্থান কাল বুঝতেন না? 'বুদ্ধচরিত' আমার অত্যন্ত প্রিয়কাব্যগুলির মধ্যে একটি। অশ্বঘোষকে অবিবেচক বলে মনে হয়নি, তিনি স্থান কাল বুঝতেন। কিন্তু রীতি ছিল এই রকমই। আর একটি বিরহদুঃখে বিহ্বল পুরুষের উক্তি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়। তিনি রামগিরি পর্বতনিবাসী অভিশপ্ত যক্ষ। রাজকার্যে অবহেলা করায় তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। অলকাপুরীতে তাঁর স্ত্রী রয়ে গেছেন। বন্ধু মেঘকে সংবাদবহন করে নিয়ে যাবার জন্য নানা নির্দেশ সহ নানা উপদেশ ও বর্ণনা দিচ্ছেন বিরহবিহ্বল যক্ষ। সেই নির্দেশ ও বর্ণনার শেষ ভাগে তিনি চিনিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী যক্ষিণীকে। সেই সব উক্তিতে দেহক্ষুধার অবারণ বিকাশ ঘটেছে, নারীদেহ ভোগের লোলুপ পিপাসা সেখানে বাধা পায়নি। সেই উত্তরমেঘে। এ যুগের পণ্ডিত-কবি বুদ্ধদেব বসু তাই মেঘদূতম্-এর যক্ষকে 'প্রেমিক' বলতে পারেন নি। বলেছেন—লিবিডোভারাতুর জীব।[২]

কালিদাস সৎ কবি। তিনি সুমহান প্রতিভার অধিকারী হলেও নারীকে তিনি সুন্দরীতমা ও ভোগ্যা রূপে দেখেই আমাদের কাছে প্রিয়তমা রূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'তন্বী শ্যামা' নারী আমাদের প্রিয়তাকে উন্মুখ করে

১ অনুবাদ: তারাপদ ভট্টাচার্য।

২ পৃঃ ৪৯ কালিদাসের মেঘদূত, বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৭।

তুলেছে যুগ যুগ ধরে। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা নারীকে ভালোবাসতে শিখেছি দেহগত সৌন্দর্যের সারভূত প্রতিমূর্তি জেনে। তিনি বর্ণনা করেছেন—

সেখানে একহারা যুবতী শ্যামা অয়ি দশনপাঁতি যার সূক্ষ্ম,
ওষ্ঠ তেলাকুচা ফলের মতো পাকা, মধ্যে ক্ষীণ, চোখ হরিণীর
মতন সচকিত, নিম্ন নাভি যার, স্তনের ভারে রূপ নম্র—
তিলোত্তমা তিনি সকল যুবতীর, বিধাতা সেই মতো গড়েছেন![১]

এই রকম পত্নী আমাদের প্রায় সকলেরই নিজ প্রিয়া বা পত্নীর আদর্শ হয়ে উঠেছে। কালিদাস দেহসৌন্দর্যকে একটি শুদ্ধ রূপপ্রথায় আরোপ করতে পেরেছিলেন মনে হলেও কামদৃষ্টি থেকে তিনিও বিরত থাকতে পারেননি। জগন্মাতা পার্বতীর নবযৌবনা দেহসৌন্দর্যের অংশে অংশে বর্ণনা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি তিনি। কুমারসম্ভবের কবি কালিদাস প্রথমে পার্বতীর পদনখ দেখেছেন, তারপর তাঁর দৃষ্টি ধীরে ধীরে সচেতন আগ্রহে উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে স্বামীর দৃষ্টি, প্রেমিকের দৃষ্টি, রূপমুগ্ধ কবির দৃষ্টির সঙ্গে নিছক পাপজীবী ভোগীর দৃষ্টির পার্থক্য অনেক সময় ধরা পড়ে না। বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের স্থানবিশেষ লক্ষ্য করুন। রামের অস্ত্রাঘাতে স্বর্ণহরিণবেশী মারীচ মারা গেল। মৃত্যুর আগে চীৎকার করলো—'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ'। সেই চীৎকার শুনে ব্যথাবিমূঢ়া সীতা লক্ষ্মণকে অভাবিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণ রামের অন্বেষণে গেলেন সীতাকে একলা রেখে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ছদ্মবেশী রাবণ সীতার কাছে এলেন।—

"সীতা সজল নয়নে পর্ণশালায় বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে রাবণ মুগ্ধ হলেন এবং বেদবাক্য উচ্চারণ করে বললেন—হে রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণা, তোমাকে পদ্মিনীর ন্যায় দেখছি, তুমি কি হ্রী, শ্রী, কীর্তি, লক্ষ্মী,

১ অনুবাদ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

অপ্সরা, অষ্টসিদ্ধি, না স্বৈরচারিণী রতি!—তোমার দশনরাজি সমান সুগঠিত চিক্কণ ও শুভ্র। নেত্র নির্মল ও আয়ত, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল; উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। তোমার ঐ উচ্চ বর্তুল, দৃঢ় ও লোভজনক স্তনযুগল উত্তম মণিময় আভরণে ভূষিত। তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য সুন্দর। অসিত নয়না, মাল্য গন্ধ বস্ত্র সবই তোমার অঙ্গস্পর্শে শ্লাঘ্য হয়েছে। তোমার পতিকেও ধন্য মনে করি। তুমি কে, কার নারী, কোথা থেকে এসেছ? কল্যাণী, তুমি কি জন্য এই রাক্ষসসেবিত ঘোর দণ্ডকবনে একাকী রয়েছ?"[1]

রূপমুগ্ধ রাবণ এখানে খল তস্করমাত্র নন। তিনি সীতাকে 'কল্যাণী' সম্বোধন করেন, অথচ সীতার 'স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য' বক্ষসৌন্দর্যের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকে। 'কল্যাণী' সম্বোধন ও 'তালফল' দর্শন, কেমন করে মিলে যায়, আমাদের একালের বোধে তা ধরা পড়ে না!

আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি, ভারতীয় অন্য এক মহাকাব্যের মহানায়িকার রূপবর্ণনা কালেও কবিদৃষ্টি রূপলোলুপ ভোগলোলুপ হতে সংকোচ বোধ করেনি। দ্রৌপদীর কথা বলছি। মহানায়িকা শ্যামশ্রী দ্রৌপদীর রূপ সত্যিকার কেমন ছিল জানি না, কিন্তু 'যাজ্ঞসেনী' দ্রৌপদীকে দেখে বহু পুরুষই কামার্ত হয়েছে। কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, কীচক—তালিকা দীর্ঘ করা যায়, এবং যুধিষ্ঠিরও সে তালিকা থেকে বাদ পড়েন না। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর আবির্ভাব পুণ্যশীল, সংযত ও ভাস্বর পবিত্রতায় মণ্ডিত। মাতার পর্ণকুটীরের সামনে পাঁচ ভাই সহ দ্রৌপদী এসে দাঁড়ালেন। মাতা কুন্তীর অভাবিত নির্দেশ শুনে দ্রৌপদীকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে দেখলেন যুধিষ্ঠির। এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিরাবিল ছিল না। দুর্যোধন ও দুঃশাসন তাঁদের এই ভ্রাতৃবধূকে কামনা করতেন এবং তার উচ্চকণ্ঠ প্রমাণ পাই দ্যূতক্রীড়া সভায়। আপন উরু দেখাতেও পেরেছেন

[1] অনুবাদ: রাজশেখর বসু

দুর্যোধন। আর আমরা দেখেছি, রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে। জয়দ্রথ নিকট আত্মীয়, কামার্ত হয়েছে বনবাসিনী দ্রৌপদীকে দেখে। কামান্ধ হয়েছে কীচক। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর শরীরে ছিল কামনার রাজ-ঐশ্বর্য, তবু তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মাধুর্যময়ী। সেই মাধুর্যময়তার সন্ধান পাই বনবাস পর্বে 'দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ' অধ্যায়ে। এখানে শুধু মাধুর্য-কথন নয়, দ্রৌপদীর সুগৃহিণীরূপের সার্থক প্রকাশ, দ্রৌপদী চরিত্রের সুবুদ্ধিদীপ্ত বিকাশ। এখানে দ্রৌপদী আর দূরতমা মহানায়িকা হয়ে থাকেন নি, আমাদের দুদিন-দিয়ে-ঘেরা ঘরের গৃহিণী হয়ে উঠেছেন।

নারীর রূপবর্ণনা কতখানি কাম-উদ্রেককারী হতে পারে তার উদাহরণ ঐ দ্রৌপদীবর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। 'বিরাট পর্বে' রাজমহিষী সুদেষ্ণার চোখেও দ্রৌপদী ঘোর কামনাময়ী—

> "অসিতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুঞ্চিত কেশপাশ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে তুলে কৃষ্ণবর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে বিচরণ করছিলেন। বিরাট রাজার মহিষী কেকয় রাজকন্যা সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমাকে পোষণ করবেন, আমি তাঁর কর্ম করব। সুদেষ্ণা বললেন, ভাবিনী, তুমি যা বলছ তোমার মতন নারী তা হতে পারে না, তুমি নিজেই বহু দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার গুলফ (গোড়ালি) উচ্চ নয়, উরুদ্বয় স্পর্শ করে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব গভীর, স্তনদ্বয় নিতম্বদ্বয় নাসিকা ও মন উন্নত, দুই পদতল দুই করতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংস গদগদ ভাষিণী সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীননিতম্বা পীনপয়োধরা, কাশ্মিরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। তুমি কদাচ দাসী হতে পার না। তুমি কে তা বল, যক্ষী দেবী গন্ধর্বী না অপ্সরা?"[১]

অনুবাদ: রাজশেখর বসু।

শুধু তাই নয়, সুদেষ্ণা নিজের রূপের সঙ্গে দ্রৌপদীর রূপের তুলনা করে ভয় পেয়েছেন, রাজা দ্রৌপদীকে দেখলে লুব্ধ হবেন। নারীর রূপ নারীর মনে ভয় জাগাচ্ছে এইভাবে।

নারী অন্যত্রও ছলে ও কৌশলে সুযোগের সদব্যবহার করেছে, নিজের রূপ দেখিয়েছে পুরুষকে লোভার্ত করার উদ্দেশ্যে। মাঘ তাঁর শিশুপালবধম্ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ঋতুবর্ণনা কালে বলেছেন—

ইতি গদন্তমনন্তরমঙ্গনা ভুজযুগোন্নমনোচ্চতরস্তনী।

প্রণয়িনং রভসাদুদরশ্রিয়া বলিভয়ালিভয়াদিব সস্বজে॥

'প্রিয়তম এরূপ বলায় রমণী যেন ভ্রমরের ভয়ে সজোরে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করলো, আলিঙ্গন কালে বাহুযুগল উত্তোলন করায় স্তনদ্বয় সাতিশয় উচ্চ হয়েছিল ও তার বলিযুক্ত উদরশোভা প্রকটিত হয়েছিল।'

ভ্রমরের ভয় এবং নায়িকার এবম্বিধ কার্যকলাপ স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাভাবিক নয় কবিদৃষ্টি। একে নান্দনিক স্বচ্ছ দৃষ্টি বলে না, কুটিল দুষ্টদৃষ্টি বলে। অমরুশতক,[২] ঋতুসংহার, শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারশতক, গাথাসপ্তশতীতে[৩] এই রকম উদাহরণ অনেক আছে। উদাহরণ আছে জয়দেবের গীত-গোবিন্দে। কিন্তু আমাদের কালের কবিতা এই সব নারীঘটিত ক্রিয়াকাণ্ডের দিকে ঠিক এই রকম ভাবে দৃষ্টি দেয় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বাঙালী কবিরা নারীর রূপ সম্বন্ধে কুশলী বর্ণনায় নতুন কিছু যোগ করেননি, তাঁদের বর্ণনা পূর্বসূরিদের অনুকারী। এই ধরণের বর্ণনা পড়তে পড়তে ক্লান্ত জনৈক পণ্ডিত তাই সক্রোধে বলেছেন—

"কবিগণ এখন বুদ্ধিসাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন।

যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়। প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে। আমরা নৈষধচরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন, বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল—'হে রাজন! দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সে চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়? দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতে সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে ক্ষুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে। বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্মাণ করিয়াছেন, সেইজন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে। দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন স্বরূপ জলদুর্গে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস হইতেছে না। দময়ন্তীর পূর্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তারপর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য।'—বহু পত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ফার্সী ও উর্দু হইতেও যথাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন। 'তাহার কালো চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ, তাহার নখরজ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের ন্যায়, তাহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম—বরং তাহারও অর্ধেক (জেলেখা), সুন্দরী স্নানান্তে মেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলির দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে (বদরচাচ)।' এই শেষের কয়েক ছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির 'চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিমহারা॥' স্বভাবতই মনে পড়িবে। এইরূপ অতিশয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতিবুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া

অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্যের বর্ধক নহে—ক্ষতিকারক।”[১]

দীনেশচন্দ্রের এই দীর্ঘ উক্তি থেকে আমরা তিনটি সূত্র পাই। (১) বুদ্ধিজাত রূপবর্ণনা কোন কাজের নয়। (২) উপমার অতিরঞ্জনে নারী সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। (৩) বাঙালী কবিরা শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করেননি, আরবী ফারসী সাহিত্যের অন্তর্গত রূপবর্ণনারও অনুকরণ করেছেন। 'প্রকৃতরূপের আর কে খোঁজ রাখে'—দীনেশচন্দ্রের এই অনুযোগ সত্য হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনার বিষয়ে। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা কালেই প্রসঙ্গতঃ ঐ দীর্ঘ উক্তি করেছেন। তাহলেও ঐ উক্তি সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য সম্বন্ধেও সত্য। বিদ্যাপতি থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত দীর্ঘ সাহিত্যযাত্রার সর্বত্রই প্রায় এই রকম অন্ধ অনুকরণ। তাই আমাদের সংকলনে উদ্ধৃত অনন্ত দাসের রাধা, কৃত্তিবাসের সীতা, কবিকঙ্কনের গৌরী, বিজয় গুপ্তের মনসা, দৌলত কাজির সতী ময়না, আলাওলের পদ্মাবতী, কাশীরাম দাসের দ্রৌপদী[২] প্রভৃতি সকলেই একই রূপবর্ণনার পুনরাবৃত্তির দ্বারা চিহ্নিত। এবং ভারতচন্দ্রে তার চরম প্রকাশ। ভারতচন্দ্র ছিলেন পণ্ডিত কবি, বহু ভাষাবিদ, সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁর অধিগমন বাল্যাবধি। ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনা যতই 'বাকছল'-সমৃদ্ধ ও 'শব্দমন্ত্র'-যুক্ত হোক না কেন, আমাদের বীতরাগ চরমে ওঠে ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেই। তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে গণেশবন্দনা, শিববন্দনা, সূর্যবন্দনা, বিষ্ণুবন্দনার পর কৌষিকীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, অন্নপূর্ণাবন্দনা প্রভৃতি রীতি-সম্মত বন্দনাবলী রচিত হয়েছে। দেবী হলেও নারীরূপ বর্ণনায় একই দৃষ্টিভঙ্গি, একই উপমার পুনরাবৃত্তি কি ভাবে ঘটেছে তা দেখার জন্য পরপর উদ্ধৃতি দিই—

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

২ পৃঃ ১০-২২, কবিতার নারী।

কৌষিকী বন্দনা

দিনমুখরবি কোকনদছবি অতুলপদ দুখানি। রতন নূপুর বাজয়ে মধুর ভ্রমরঝংকার মানি॥ হেমকরিকর উরু মনোহর রতন কদলিকায়। কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর অমূল্য অম্বর তায়॥ কমল কোরক কদম্বনিন্দক করিসুতকুম্ভ উচ। কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত অমৃতপুরিত কুচ॥ সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ কনকমৃণাল রাজে। নানা আভরণ অতি সুশোভন কনককঙ্কন বাজে। কোটি শশধর বদনসুন্দর ঈষদ মধুর হাস। সিন্দুর মার্জিত মুকুতা রঞ্জিত দশনপাঁতি প্রকাশ॥

লক্ষ্মীবন্দনা

কমল-চরণ কমল-বদন কমলনাভি গভীর। কমল দু'কর কমল অধর কমলময় শরীর॥ কমলকোরক কদম্বনিন্দক সুধার কলস কুচ। করিঅরি মাজে জিনি করিরাজে কুম্ভযুগ চারু উচ। সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ। লজ্জার কাঁচুলি চমকি বিজলি বসনলক্ষ্মীবিলাস॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা

রক্ত সরসিজোপরি বাস পদ্মাসন করি পদতলে নবরবি দেখা। রক্তজবা প্রভাহর অতি মনোহরতর ধ্বজবজ্রাংকুশ ঊর্দ্ধরেখা॥ কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিনী। শোভে নিরুপম বাস দশদিশ পরকাশ ত্রিভুবনমোহনকারিণী॥ কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধা সরোবর উচ্চ কুচ সুধার কলস। কণ্ঠে কম্বুরাজ রাজে নানা অলংকার সাজে প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ॥ কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব হর অঙ্গুলি চম্পক চারুদল। ফণিরাজ ফণমণি কঙ্কনের কনকনি নানা অলংকার ঝলমল॥

মহাদেবের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা পুরীনির্মাণ করলেন কাশীতে এবং অন্নপূর্ণার

মূর্তি গড়ে মন্দিরে স্থাপন করলেন। জগজ্জননী অন্নপূর্ণার মূর্তি। কিন্তু এই দেবীমূর্তির বর্ণনাও কামোদ্রেককারী, নির্লজ্জ এবং পুনরুক্তিদোষদুষ্ট। 'বর্ণনা' ও 'বন্দনা'র ভাষা প্রায় এক। উপরন্তু নিম্নাঙ্গের কামরোমাবলীর বর্ণনা দিয়ে ভারতচন্দ্র সর্বপ্রকার শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করেছেন।[১]—

অন্নপূর্ণা মূর্তি বর্ণনা

অতি নিরমল চরণযুগল সুশোভিত নখ ছাঁদে। দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন কত শোভা হবে চাঁদে ॥ মণিকরিকর উরু মনোহর নিতম্বে রত্নকিঙ্কিনী। ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণী ॥ শোভা সরোবর নাভি মনোহর মদনশফরীধাম। কামের কুন্তল অতি সুকোমল রোমাবলী অভিরাম ॥ স্বয়ম্ভু শংকর উচ কুচবর সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে। রতন কমল মৃণাল কোমল সুবলিত ভুজ সাজে ॥

শুধু তাই নয়, ছদ্মবেশে দেবী অন্নপূর্ণা ব্যাসদেবকে প্রবঞ্চিত করবেন। সেই ছদ্মবেশের বর্ণনাচমৎকরিত্বের মধ্যেও পূর্বপ্রথাগত নারীদেহ বর্ণনার অনুকরণ বর্তমান।[২] তবে পার্থক্য এই, বন্দনাকালে দেবীরূপের 'বর্ণনা' আরম্ভ হয়েছে পদযুগল থেকে, ('বর্ণনা' কালেও তাই), এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঊর্ধ্বগতি লাভ করেছে। কিন্তু মানবী বর্ণনা ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে অর্থাৎ কেশপাশ বা মুখমণ্ডল থেকে পদযুগলে অবতরণ করেছে দৃষ্টি। সর্বত্রই সেই দাড়িম্ব বা করিকুম্ভ বা করিশুণ্ড বা কদলীতরু বা পদ্ম ও মৃণাল বা সরোবর ও সাগরের উপমা। এর মধ্যেও মজা আছে! অন্নদামঙ্গল কাব্যে মহাদেব ও অন্নপূর্ণা উভয়েরই প্রাধান্য। অন্নপূর্ণার স্তনবর্ণনা কালে 'স্বয়ম্ভু শিব'-এর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। 'স্বয়ম্ভু শংকর উচ কুচবর' অর্থাৎ পত্নীর স্তন স্বামীর মত!

---

১ অবশ্য এক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র কালিদাসের অন্ধ অনুগামী। কুমারসম্ভবে 'পার্বতীর নাভির চারিদিকে নবোদ্গত অতি সূক্ষ্ম রোমাবলী'র বর্ণনা আছে।

২ পৃঃ ২৪, কবিতার নারী।

এই ধরণের প্রথানুগত্য সৌন্দর্যকে পরিণত করেছে স্থূল বস্তুতে। এবং সেই সব বস্তু চয়নেও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় নেই। নারীর উরু হাতির শুঁড়ের মত যাঁরা বলেন তাঁরা হাতি দেখেন নি। হাতির শুঁড় যেমন কালো কুৎসিৎ তেমনি খসখসে কর্কশ ও খাঁজকাটা। অবশ্য ক্রমসরু হয়েছে বলেই কি মিল টানা হয়েছে? তাতেও সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।

এর মধ্যে ক্বচিৎ দেখা গেছে, বস্তু পরিধির সীমা অতিক্রম করে সুধাময় হাসির ছটা আর দৃষ্টিতে সুধার প্রকাশ 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর'-সেই গুণের ইঙ্গিতও প্রায় উহ্য। 'কথায় হীরার ধার' থাকলেও মনের হীরকদ্যুতি বিভাসিত হয়েছে কই? ভারতচন্দ্রের হীরা ও বিদ্যা ঐ একই বস্তুগ্রন্থনার উদাহরণ বহন করছে।

তত্রাচ ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি। গত যুগের অনুকৃতি যেমন তাঁর মধ্যে আছে আগামী যুগের সম্ভাবনাসূত্রও তাঁর মধ্যে থাকবে। তাই বুঝি 'সরস্বতী বন্দনা'য় সরস্বতীর দেহবর্ণনা তিনি করেন নি। কৌষিকী, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণার দেহবর্ণনার মধ্যে সরস্বতী বর্ণনায় এ রকম ছেদ পড়লো কেন? ওখানেই কি যুগসন্ধির আগামী লক্ষণ? হরিহোড়ের পরম দরিদ্র মাতার রূপ বর্ণনাতেও পুরানো ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ নেই। যথা—

> হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥ লতাবান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥ অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম সার। গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥

মনে রাখতে হবে এ বর্ণনা কোন নারীদেবতার বর্ণনা নয়, সাধারণ অতি সাধারণ বনবাসিনী এক মানবীর বর্ণনা। তখনো হরিহোড় গর্ভে আসেনি। কবিদৃষ্টি কিন্তু অলংকার শাস্ত্রনির্ধারিত 'পদ্মিনী' নারীর কথা এখানেও ভোলেন নি এবং স্তনসৌন্দর্য থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে নেননি।

দেবী আর মানবী বাঙালী কবির চোখে কেমন করে পার্থক্য হারিয়ে ফেলে

তার চরম উদাহরণ শাক্ত কবিদের কালীবন্দনাযুক্ত রূপবর্ণনায় আছে। মহাতব চাঁদের 'ষোড়শী ভবঅঙ্গনা'র সৌন্দর্য বর্ণনায় শুনি—

কাঞ্চিযুক্ত নিতম্বিনী ললিত ত্রিবলীশ্রেণী, চতুর্ভুজ বিধায়িনী,
রক্তাম্বর পরিধানা। পাশাঙ্কুশ যুগ্ম করে, ধনুর্বান শোভে অপরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে, উরু কদলীতুলনা।

কামকলা বর্ণনাপটু ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ভক্তপ্রবর মহাতব চাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এই যে ভারতচন্দ্র স্থির ও ধীর অভিনিবেশে দেখেছেন আর মহাতব চাঁদ দেখেছেন অস্থির ও এলোমেলো দৃষ্টিতে।[১] অবশ্য মহাতব চাঁদ কোন ব্যতিক্রম নন বা উৎকট উদাহরণ নন। তন্ত্রোক্ত কালীধ্যান মন্ত্রে পেয়েছি—

কর্ণাবতংসতানীত শতযুগ্ম ভয়ানকান্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥

দিগম্বরী দেবীর করালবদন ও মুক্তকেশের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনাই শুধু নয়, রতিসুখে সুখী দেবীর প্রসন্ন বদনের বর্ণনাও তন্ত্রসার গ্রন্থে পাই। ভারতীয় কল্পনার এক চরম ও পরম বিকাশ দশমহাবিদ্যা পরিকল্পনায়, এই সত্য স্বীকার করে নিয়ে আমাদের নীরব থাকতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত ও ভারতচন্দ্র উভয় কাব্যধারারই অনুবর্তী কিন্তু নিতান্তই কুৎসিৎ। 'নায়কের উক্তি' এমনই রুচিহীন যে পড়া যায় না, যতই তার মধ্যে বাচনভঙ্গির মারপ্যাঁচ থাকুক না কেন।[২] ঈশ্বর গুপ্ত রসিক নন, রসভোক্তাও নন। নারী বা নারীসৌন্দর্যকে তিনি সংস্কৃত কবিদের মতো, ভারতচন্দ্রের মতো অতিশয়োক্তি অলংকারে মণ্ডিত করে যথার্থ সম্মানও দিতে জানতেন না।

তুলনায় অনেক বেশি সম্মান দিয়েছেন, আধুনিক বাংলা কাব্যের নিঃসঙ্গ মহাকবি শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের তিলোত্তমার রূপবর্ণনায়[৩] যে মেজাজ

১ পৃঃ ২৫, কবিতার নারী।
২ পৃঃ ২৬, ঐ
৩ পৃঃ ২৭-৩০, ঐ

তা সংস্কৃত কবিদের মেজাজ এবং ভারতচন্দ্রের মতো বাকনিপুণতায় লক্ষণীয়। কিন্তু মধুসূদন নারীকে ও নারীর ক্লাসিক রূপকে যথার্থ সম্মান দিতে জানতেন। তিলোত্তমার মূর্তিরচনা শেষ হলে নানা দেবতা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং অকপটে উচ্চারণ করেছেন—"সাবাসি, ওহে দেবশিল্পি গুণি! ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে।" এ প্রশংসা শুধু দেবতাদের মুখের কথা নয়, মধুসূদনেরও মনের কথা। যুদ্ধ-সাজে সজ্জিতা প্রেমগর্বে গৌরবিনী প্রমীলাকে 'পতিমন্দিরে' দেখে মেঘনাদও প্রণাম নিবেদন করতে চেয়েছে দাম্পত্য নাটকের সরস সজীব ভঙ্গিতে—'অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে—রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি, আইলা কৈলাসধামে: যদি আজ্ঞা কর, পড়ি পদতলে তবে, চিরদাস আমি তোমার, চামুণ্ডে!' কিন্তু প্রমীলার দেহরূপ বর্ণনায় মধুসূদন চিরাচরিত প্রথারই অনুসরণ করেছেন। তাঁর রূপবর্ণনাতেও সেই উচ্চ কুচযুগ, সেই 'বর্তুল যথা রম্ভা বনআভা উরুদেশ' প্রভৃতির আয়োজন। তবু সেই চির প্রথানুগতোর উপর বীরাঙ্গনার ও বীরাঙ্গনা সঙ্গিনীদের বর্ণনায় অভাবিত অদৃষ্টপূর্ব ঔজ্জ্বল্য আরোপিত হয়েছে। কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের ঐ মহাকাব্যিক তেজঃদীপ্ত বর্ণনার পরই যখন শুনি—'গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি সখীবৃন্দে' তখন পূর্বপ্রশংসিত সমস্ত উজ্জ্বলতা নিভে যায়। 'নিতম্বিনী' বিশেষণের দ্বারা প্রমীলাকে বিশেষিত করার ফলে সযত্নসৃষ্ট বীরাঙ্গনা রূপটি খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে। ভোগলক্ষণ তেজলক্ষণকে ম্লান করে দেয়। দানবনন্দিনী, তেজস্বিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, কেশরিণী, ভৈরবরূপিণী প্রভৃতি বিশেষণের পাশাপাশি 'নিতম্বিনী' বিশেষণের একাধিক ব্যবহার মধুসূদনের কবিমর্যাদা ও রুচিবোধকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রভাব এমনই অমোঘ!

বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত অন্য এক দত্তকুলোদ্ভব কবি সুধীন্দ্রনাথও সংস্কৃত কাব্যরীতিসম্মত নারীদেহবর্ণনার ও ব্যাখ্যার মানসপ্রবণতাটি

অতিক্রম করতে পারেন নি। আমাদের সংকলনে আহৃত তাঁর কবিতা 'সংশয়'[১] বাক্‌বিন্যাসে ও অলংকার বিন্যাস নৈপুণ্যে অনবদ্য, অনবদ্য ছন্দ-দোলায়িত ভাবাগরিমায়। কিন্তু তিনিও যখন বেণীমূল থেকে আরম্ভ করে বক্ষের যুগল হেমগিরি পার হয়ে সুনাভি ও উরুতোরণে নেমে আসেন তখন মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক বিদেশী কাব্যের ভাবদীক্ষা গ্রহণ করেও অন্ততঃ এক্ষেত্রে আধুনিক হতে পারেন নি, সংস্কৃত রূপকলারই প্রভাব মেনে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নারীরূপের কাব্য লেখেননি, নারীপ্রেমের কাব্য লিখেছেন। সে প্রেম পুরুষের প্রেম। যদিও নারীর উক্তি কখনও কখনও শুনেছি। নববিবাহিত রবীন্দ্রনাথ তখন দেহসুধারসে মগ্ন, লিখছেন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কবিতাগুলি। সংস্কৃত কাব্যসম্ভব রূপচেতনা থেকে দূরে সরে আসতে তিনি পেরেছিলেন। 'স্তন' সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কবিতা রচনার সাহস দেখিয়েও তিনি জয়দেবের মতো স্তনসৌন্দর্যলুব্ধ কবি হয়ে ওঠেন নি। মাতৃস্তনের মহিমাগান করে তিনি সৌন্দর্য পিপাসার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি জেনেছেন সবই 'নিষ্ফল কামনা'। গীতগোবিন্দম্ রচনার সময় জয়দেবের বয়স কত ছিল জানি না, কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের কাছাকাছি রচিত রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্য মদিরময় প্রেমের বাণীবহন করলেও সমগ্র কাব্যের মধ্যে কোথাও 'স্তন' শব্দটি উচ্চারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নারী শ্যামা সুন্দরী প্রতিভাময়ী, মনঃসম্পদে মহীয়সী। নারীসৌন্দর্য দূর থেকে দেখার নির্দেশ দিয়েও তিনি সংস্কৃত কবিদের মতো নারীর দেহরূপবিলাসী হয়ে ওঠেন নি। একটি রোমান্টিক বিচ্ছেদবোধ ও দূরত্বের বেদনা তাঁকে সর্বদাই রক্ষা করেছিল, তাঁর প্রেমভাবনাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছিল। নারীরূপাকর্ষণকে অস্বীকার না করেও তিনি সংযত হয়েছিলেন। জীবনে ও কাব্যে তিনি প্রথানুগত্য করেননি।

একেবারে সাম্প্রতিক কালে নারীরূপ সম্বন্ধে বাঙালী কবিরা দু'রকমের

[১] পৃঃ ৪৪, কবিতার নারী।

মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এক. অসাধারণ সৌন্দর্যমুগ্ধতার মনোভাব। দুই. অশ্রদ্ধেয় পঙ্কিল মনোভাব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যে[১] নারীকে ঘৃণ্য ও ক্লিন্ন করে দেখার এক অশ্লীলতম ন্যক্কারজনক প্রবণতা দেখা গেছে। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি যথার্থ সৌন্দর্যে ও রূপানন্দে এবং প্রেমে পৌঁছাতে পেরেছেন 'নীরা'র হাত ধরে।[২] একই রকম অশালীন ও বিকৃতিকামী প্রবণতার শরিক হয়েছেন বিনয় মজুমদার। তাঁর 'চাঁদ' ও 'ভুট্টা' প্রতীকভাবনা যেমন ঘৃণ্য তেমনি কুৎসিত। অভিজিৎ ঘোষের মধ্যেও সেই রকম এক ভোগলোলুপ অশালীন কামবৃত্তির দুর্বার প্রকাশ দেখা গেছে। বাংলা কাব্যের ষাটের দশকের ছোট বড় বহু কবি এই ভাবেই নারীকে অসম্মান করেছেন, অবমাননা করেছেন নারীরূপের ও নারীমাধুর্যের। ঐ বিকৃত মানসিকতাটি আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি।

এরই মধ্যে কোন কোন কবি নারীদেহকে দেখেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে না হলেও, তাঁদের উপমা রূপক ও বাচনভঙ্গির নতুনত্ব অসাধারণ রূপে নতুন। এই সব কবিরা সংস্কৃত সাহিত্যদীক্ষিত নন, নারীদেহের ধীর খণ্ডানুখণ্ড বর্ণনা করেন না। তাঁদের চোখের সামনে নারীনগ্নতা সৌন্দর্যসম্পূর্ণতা নিয়ে দাঁড়ালেও থেকে যায় রোমান্টিক কুয়াশা আর অলৌকিক জ্যোৎস্নার আবরণ। যেমন তুষার রায়ের 'নগ্নতা' নামক কবিতায়—

দেহের লীলায়িত রেখারা খুঁজছে মুক্তি
রঙিন ভয়েল যেন শুক্তি হয়ে ঢেকে রাখে মুক্তো
মৃদু লাস্যের কম্পনে ঝরে যায়
                    গায়ে মাখা শাড়ি
এই গূঢ় সংকাশ
এই কি নগ্নতা না কি পেলব গোলাপী

অচপল চোখে যেন মুক্তির মতো মগ্নতা
শ্লীলতার কি সরল প্রকাশের নাম নগ্নতা
যাকে নিয়ে পূজা করা যায়, সেই ছবি
মনে হয় পাপহীন এ দেহ মন্দির যেন ।[১]

আবার যখন পুংখানুপুংখ রূপবৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে তখনও থাকে না মধ্যযুগীয় ক্লাসিক স্পষ্টতা বা আদিরসাত্মক কামুকতা। যেমন কমল চক্রবর্তীর কবিতায় দেহগন্ধী মনস্বতার প্রমাণ প্রাচুর্য থাকলেও দেহের জন্যই দেহকে তিনি চিনে নেন না তাঁর 'হে নারী' কবিতায়—

সেই আশীর্বাদ
সেই নদী অন্য কারো বুকে নেই
অন্য কারো চুল নয় এত কালো, যেন অভিশাপ
যেন প্রবঞ্চিত হরিণেরা অশ্রু ফেলে গড়েছে নয়ন
দেবতার হাসি দিয়ে তৈরী জঘন, তাও জানি
অসংখ্য নারীর ঈর্ষা তোমার উরুর কালো তিল
বহু জয়, বহু উচ্চাশা, মোষের ক্রোধের মত গ্রীবা,
বারো কোটি লোক মারা গেলে তার বেদনার মসৃণতা
তোমার শরীরে, তোমার নাভিতে অমরতা ।[২]

এখানে সংস্কৃত ভাবনাসম্মত অতিশয়োক্তি আছে, সংস্কৃত তুলনাধর্মী উপমা রূপকের সহায়তাও আছে, কিন্তু সংস্কৃত কবিদের অভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে কমল চক্রবর্তী দেখেন নি। এখানে সহায়তা আছে আরবী ফারসী কবিদেরও। তিল সম্বন্ধে ভাষণে। তবু কী অসাধারণ সব উপমার বেগাবর্ত রচনা করেছেন তিনি। এর আগে কেউ বলেন নি, দেবতার হাসি দিয়ে তৈরী জঙ্ঘার কথা, বারো কোটি লোক মারা গেলে তার

বেদনার মন্থনতা দিয়ে তৈরী ত্বক-লাবণ্যের কথা।

তবু একথা সত্য যে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ বা ভাস্কর রামকিংকরের মতো মুক্তদৃষ্টি লাভ করতে পারেন নি আধুনিক বাঙালী কবিরা। সংস্কৃত কবিরা নারীকে বসন ভূষণ অলংকার সজ্জার মধ্যে কি করে এত স্পষ্ট দেখতে পেতেন জানি না! আধুনিক বাঙালী কবিদের সে সাহসটুকুও নেই। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতায় যে সম্ভাবনা ছিল তা সফল হয়নি। সাম্প্রতিক বাঙালী কবিরা পুরোনো মধ্যযুগীয় বর্ণনারীতির পাশ কাটিয়ে নতুন ব্যঞ্জনা ও বক্তব্য আনতে পেরেছেন। কিন্তু কবি রিলকের মতো সাহসে ও শক্তিতে তাঁরা এখনো কেউই ভর করতে পারেন নি। রিলকের নিজের ভাষা আমি জানি না, বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ থেকে স্মরণ করি, সমগ্র কবিতা নয়, কবিতাটির অংশ বিশেষ—

"আর উদরটি শ্রোণীচক্রের পাত্রে
আশ্রিত, যেন শিশুর হাতে তরুণ কোনো ফল।
আর সেখানে, তার নাভির অপরিসর ভাণ্ডে
জমে উঠলো সমস্ত এই প্রাণ—তিমিরলিপ্ত, উজ্জ্বল।
তারই তলায় উদীয়মান ক্ষুদ্র স্ফীতিটি
ঢেউ তুললো নিরন্তর সেই কটিতটের দিকে,
যেখানে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে একটি নিঃশব্দ জলরেখা।
তবু, ঈষদচ্ছ, এখনো ছায়ারহিত,
পড়ে রইলো, এক ঝাড় এপ্রিলের বাঁচগাছের মতো,
উষ্ণ, শূন্য, উন্মুক্ত যোনিদেশ।"[১]

ভিনাসের শারীর সৌন্দর্যের অন্যান্য অংশের বর্ণনাতেও এবম্বিধ কাব্যিক গরিমা আছে। আমি প্রাক্সিটিলিস, ক্যাবানেল, বত্তিচেল্লি, ইন্গ্রেসের ভিনাসের ছবি দেখেছি। আমাদের কোণার্ক সুন্দরীদের নিয়ে বা অন্যান্য

প্রস্তরীভূত সুন্দরীদের নিয়ে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু রিলকের সৌন্দর্যসাহস কোন বাংলা কবিতায় দেখিনি। আমাদের সংকলনে রবীন আদকের কবিতাটি[১] একটি মিষ্টি সুন্দর কবিতার উদাহরণ। রূপাই সামন্তর 'ঘরে ভালোবাসার পাখি' কাব্যে বিদেশী ভিনাস সম্বন্ধে কবিতা আছে, 'ইন্‌গ্রেসের ভিনাসকে'[২]। কিন্তু সেখানেও পরিস্ফুট সৌন্দর্যের জীবন্ত অথচ নান্দনিক প্রকাশ ঘটেনি। The human body is the highest temple of God—বাইবেলের এই সার্বজনীন সত্যটি আমাদের কবিদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা এখনো সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি Walt Whitman-এর নির্দেশে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা। 'Have you ever loved the body of a man/Have you ever loved the body of a woman'—এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও আমরা দিতে পারিনি। আমেরিকার ঐ কবি-মনীষীর মতো আমরা কেউ 'Body Electric'-এর গান গাইতে পারিনি। দীর্ঘ কবিতাটির সামান্য অংশ স্মরণ করি—

The love of the body of man or woman balks
account, the body itself balks account,
That of the male is perfect, and that of the
female is perfect.

The expression of the face balks account,
But the expression of a well-made man appears
not only in his face,
It is in his limbs and joints also, it is curiously
in the joints of his hips and wrists,
It is in his walk, the carriage of his neck, the flex
of his waist and knees, dress does not hide him,

The strong sweet quality he has strikes through
the cotton and broad cloth,
To see him pass conveys as much as the best
poem, perhaps more,
You linger to see his back, and the back of his
neck and shoulder-side.[১]

নারী ভোগ্যা ও নারী সুন্দরী। এই মনোভাবের মিশ্রণ ঘটেছে সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের সর্বত্র। যখন চারু ও উদ্দাম ভোগ্যবস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে নারী, তখন তার সঙ্গে নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীর তুলনা দেওয়া হয়েছে। এবং সে তুলনা দিয়েছে ভোগী পুরুষ। সেকালে এবং একালে উভয় কালেই। তাই একালের একজন বিদুষী নারী ও প্রিয় কবি শ্রীমতী কবিতা সিংহ অনুযোগতীব্র কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছেন, অভিযোগ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়—

"নারী স্বাধীনতা সেদিনই সার্থক হবে যেদিন নারী ভুলবে তার দেহকে। দেহ ধুয়ে ধুয়ে আর সে খাবে না। খাওয়ার কথাই যদি ঠিক, তবে বলি নারীর শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পুরুষ লেখক কবিরা বারবার কেন খাদ্যবস্তুর তুলনা করেছেন? দাড়িম্ব দেখেছেন স্তনে, কদলীর কাণ্ড ও থোড়ের মতো উরু, রসভরা আঙুরের মতো ঠোঁট, আপেলের মতো গাল, কিংবা আপেলের মতো বুক। 'কঙ্কাবতী' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু টুকটুক ঠুকরে খেয়েছেন বুক ও ঠোঁট। আরো আধুনিক পঞ্চাশের এক কবি আবার নুন মরিচের সঙ্গে উপভোগ করেছেন নারীদেহকে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সামসের আনোয়ার মহাশয় একটি কবিতায় নারীর স্তনকে আম্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।"[২]

এই অভিযোগের মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি নারীকে সৌন্দর্যের সারভূত মূর্তিরূপে দেখার সত্যও অস্বীকার্য নয়। অবশ্যই শুধু খাদ্যবস্তু নয়, মেঘ চন্দ্র পদ্ম ক্রৌঞ্চমিথুন হরিণশিশু খঞ্জন কষিতকাঞ্চন তুষার কুন্দ প্রভৃতির সঙ্গেও নারী অঙ্গ তুলিত হয়েছে। কালিদাসের প্রতি ভোগসুখ প্রবণতার অভিযোগ থাকলেও কালিদাস যে বিশুদ্ধ দেহসৌন্দর্যেরও সার্থক কবি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু তিনি ভোগ থেকে ভোগ-নিবৃত্তিতে পৌঁচেছিলেন। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজারী-কবি বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যেও আমরা পেয়েছি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি ও কবিত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত সার্থক আলোচনা করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত 'বাঙালী জীবনে রমণী' গ্রন্থে। যে কোন রসিক পাঠক পাঠিকার চিত্তমুকুরেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যধ্যানের স্বরূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। যাই হোক, কেন সংস্কৃত কবিদের রূপবর্ণনার ঐ রকম ধরণ প্রবর্তিত হয়েছিল তার একটা সহনীয় ব্যাখ্যা যেন দিতে চেয়েছেন খ্যাত মনীষী সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী—

"আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড়ো কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের বিশেষত রমণী দেহের বর্ণনা, কেন না, সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে তাও বস্তুত রমণীর রূপবর্ণনা: প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসাবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারী অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়েনি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেননি। ······আমরা আমাদের নববিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবত সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন। শুধু স্ত্রীলোক নয়, পুরুষের রূপের উপরেও তাঁদের

ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এদেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয়নি। শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন।"[২]

কিন্তু আমাদের আলোচনায় যে সব দিকের উপর আলোকপাত করে আমরা প্রশ্ন তুলেছি তার সম্পূর্ণ নিরসন, বোধ হয়, ঐ সুধীজন সম্মত উক্তিতেও হয় না।

[তিন]

খুব ভালো লাগে এই ভেবে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যে চর্যাপদে শবরীকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। কোন রাণী, রাজমহিষী বা রাজকন্যা নয়, কোন বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী বা তপস্বিনী নয়। শবরী, ডোম্বিনী, পাটনী আর প্রতিবেশিনী নিয়ে চর্যাপদের নারীভুবন। তারা ভূমিলগ্না, আমাদের জনজীবনের সহযাত্রিনী, সহকর্মিণী শ্রমরমণী তারা। ঐ সময়-পর্বের মধ্যে রচিত একটি প্রাকৃত কবিতায় শুনেছিলাম এক 'কান্তা'র কথা, যে কলাপাতা পেতে ভাগ্যবান পুরুষকে গরম ভাত খেতে দিচ্ছে, ভাতে দিচ্ছে গাওয়া ঘি, বাটিতে দিচ্ছে গরম দুধ, পাতে দিচ্ছে মৌরলা মাছ আর শাকের তরকারি। বাঙালী নারী তারপরই অলৌকিক বৃন্দাবনে চলে গেল। দেখা দিলেন শ্রীরাধিকা। আমাদের বাংলা সাহিত্যকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। তাঁকে অলৌকিক বৃন্দাবন থেকে আমাদের দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে, পরিচিত পথে ও প্রান্তরে, সমাজে ও সহবাসে আনতে আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে, মহাজন জ্ঞানদাসের সঙ্গে, ইদানীং কবিগায়কদের সঙ্গে, কিন্তু তাঁকে তেমন করে গৃহিনী সখী সচিব রূপে পাইনি। দেবতাকে প্রিয় করার আমাদের যে চিরায়ত স্বভাব সেই স্বভাবের সূত্রটি যে

রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন, তিনিই ঐ অলৌকিক বৃন্দাবনবাসিনী রাধার নেপথ্যে যে একজন না একজন ভূলোকবাসিনী প্রিয় নারী আছে সেকথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

মনে পড়ছে ঐ পদটা—

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
স্বপন দেখিনু হেনকালে।'
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন একটি মেয়ে ছিল
ভালোবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন।[১]

উমাও আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের গাঁ ঘরের পানাপুকুরের পাশের পথ দিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ী কৈলাসে যাবার রাস্তা। কিন্তু তিনি আমাদের কন্যা হয়েও আমাদের ঘরে থাকেন না। মাত্র তিন দিন থেকেই সম্বৎসরের জন্য চলে যান। ইতিমধ্যে ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, সনকা, বেহুলা, ময়নামতী প্রভৃতি ও সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, জনা, সাবিত্রী, সরমা, দময়ন্তী, সুভদ্রাদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তোলার দীর্ঘ মধ্যযুগীয় সময় পেয়েছি। কিন্তু তাঁরা কেউ বা প্রাতঃস্মরণীয়া, কেউ বা আমাদের প্রীতির গণ্ডীর বাইরে রয়ে গেছেন। মাতা ও বধূর পাশাপাশি প্রেয়সী নারীর জন্য কাব্যে অন্বেষণ আজও থামেনি। আজ মাতা নয়, বধূ নয়, কন্যা নয়, প্রেয়সী নারীদেরই সর্বাধিক গৌরব। আধুনিক বাংলা কাব্য জুড়ে তাদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

আমাদের সংকলনে নানা শ্রেণীর নারীর আগমন ঘটেছে। তার মধ্যে আছে পৌরাণিক নারী, আছে সামাজিক নারী, আছে কাল্পনিক নারী। অন্য ভাবে বিচার করলে দেখতে পাই, মাতা বধূ কন্যাই শুধু নয়, ভৈরবী

[১] স্বপ্ন, শ্যামলী কাব্য।

সন্ন্যাসিনী, গোয়ালিনী, রাজকুমারী, দেবী, বিবাহ বাড়ীর কনে, সাঁওতাল যুবতী, কলেজের মেয়ে, প্রেমিকা, পরনারী, বারাঙ্গনা, অন্তঃসত্ত্বা, বিদূষী, চাকুরীজীবিনী, নার্স, বস্তিবাসিনী, যাযাবরী, ছাত্রী, পরলোকগতা, রাজনৈতিক বন্দিনী, বিধবা, বান্ধবী এবং বিদেশিনী।

বাংলা সাহিত্যে মা বড় না প্রেয়সী বড়—সেই তর্ক তুললে দেখতে পাই প্রেয়সীই বড়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মা নিঃসন্দেহে অনেক আছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে মাকে নিয়ে কবিতা লেখা হয় ক্বচিৎ। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে মায়ের থেকে বেশি স্থান জুড়ে আছে মাধুর্যময়ী সেবাসঙ্গিনী বধূরা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা কাব্যের একটা সময় গেছে যখন কাব্যরস বলতে পরিবার রসকেই বোঝাতো। এই পরিবার-রস সঞ্চারে যেমন পুরুষ কবিদের বিশেষ প্রবণতা ছিল, তেমনি মহিলা কবিদেরও লক্ষণীয় সাধনা ছিল। রবীন্দ্রনাথই এই পরিবার-রসের অঙ্গন থেকে কাব্যকে নিয়ে এলেন নায়িকানন্দিত বিশ্বভুবনে। সহযোগিতা করেছেন সর্বাংশে বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-সাহিত্যে মা আছে কি না ধীর সন্ধানী মন নিয়ে খুঁজে দেখতে হয়। মাকে অবহেলা নয়, বধূ বা প্রেয়সীকে সম্মাননার দ্বারাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাণজীবন তৈরী হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'আমার স্ত্রী' কবিতাটিতে আমাদেরই ঘরের কথা, আমাদেরই ভালোবাসার ছবি।[১]

বারাঙ্গনাকে নিয়ে কাব্য রচনায় ওয়াল্ট হুইটম্যান ও সত্যেন্দ্রনাথ সমগোত্রীয়, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের কবিতাটি অদৃষ্টপূর্ব।[২] এমন করে কথা বলতে শরৎচন্দ্রও পারেননি। নার্সকে নিয়ে কবিতা আর কই, স্বল্পবাক কবি শংখ ঘোষ নিজের অভিজ্ঞতার ভাষা দিয়েছেন তীক্ষ্ণ সামর্থ্যে।[৩]

১ পৃঃ ৬৬, কবিতার নারী।
২ পৃঃ ৬৫, ঐ
৩ পৃঃ ৮৪, ঐ

ভৈরবীকে নিয়ে কবিতা কেই বা লিখেছেন ? রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভৈরবী আর চারণ-কবি বৈদ্যনাথের ভৈরবী তুলনাযোগ্য। ইতিমধ্যে অবধূতের উপন্যাসে[১] ভৈরবীদের লক্ষণীয় উপস্থিতি ঘটেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার দেশ বাংলায় এককালে ভৈরবীদের সংখ্যা ছিল সীমাহীন। সহজিয়া কিশোরীসাধক ভৈরবেরা বৈষ্ণব সাধনক্ষেত্রেও উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পাই। চণ্ডীদাসের রামীর মতো, বিদ্যাপতি বা কৃষ্ণদাস কবি-রাজেরও সাধনসঙ্গিনীর কথা বলা হয়েছে। যোগিনী, ব্রহ্মযোগিনী, দেয়াসিনীরা সেদিনও ছিলেন, আজও আছেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে আধুনিক কবিরা কবিতা লিখেছেন, এমন উদাহরণ নেই বললেই হয়। কারণ কি অভিজ্ঞতার অভাব ? শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ ও ষোড়শী কাহিনী ঠিক ভৈরবী জীবন-কাহিনী নয়। আজকাল সাধুসঙ্গ লাভেচ্ছু ও তীর্থ ভ্রমণপিপাসুদের রচনায় ভৈরবীদের দেখা মিলছে বারবার। আমাদের সংকলনে অমিয় চক্রবর্তী যে 'তপোদৃশ্য' রচনা করেছেন[২] তা স্বল্পরেখ সুন্দর হলেও খৃষ্টধর্মের সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়নি। সে তুলনায় হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা[৩] অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেক্ষাপট বোধ হয় বিদেশ, হৈমন্তীর প্রেক্ষাপট পরিচিত স্বদেশ। হৈমন্তী খৃষ্টপ্রিয়া সেবা-পরায়না সন্ন্যাসিনীর চরিত্র-পরিচয় দিয়েছেন সমৃদ্ধ ও বিমুগ্ধ বাণী চয়নে। তাঁর কবিতা সন্ন্যাসিনীদের আন্তরজীবন সম্বন্ধে উন্মুখ করে তুলেছে পাঠক পাঠিকাকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ' কবিতার[৪] ঐ গর্ভবতী মেয়েটির দাপট আমাদের সব অপরাধী পুরুষের প্রাণ কাঁপায়। কালো মেয়ের করুণ কাহিনীও ভোলার নয়, ভোলার নয় শাশুড়ীর নিপীড়ন। 'মেজাজ'

১ মরুতীর্থ হিংলাজ, উদ্ধারণপুরের ঘাট প্রভৃতি উপন্যাসে।
২ পৃঃ ৪৬, কবিতার নারী।
৩ পৃঃ ১১৩, ঐ
৪ পৃঃ ৭৩, ঐ

কবিতায় উপরিপাওনা ঐ শাশুড়ীর চরিত্র। কালো মেয়েদের নিয়ে, শ্যামলী মেয়েদের নিয়ে, আমাদের কবিকল্পনা যুগ যুগ বিস্তৃত। মহাভারতের মহানায়িকা দ্রৌপদী ছিলেন কালো। কালিদাসের মেঘদূতের 'শ্যামা' নারী কি 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা' ? আমার তা মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর কালো। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি ও শ্রীমতী হে কালো। জীবনানন্দের বনলতা সেন নিশ্চয়ই ফর্সা নয়, না হলে বনলতা নাম হবে কেন ! যাই হোক, জীবনানন্দের 'শ্যামলী' তো সর্ব স্মরণীয়া। বাঙালী সমাজে কালো মেয়েদের অবজ্ঞেয় অকুণ্ঠ অবস্থিতি, কিন্তু সেই গ্লানি বাংলা কবিতাকে স্পর্শ করেনি। শেকস্পীয়রের Black Girl-এর মতো না হলেও, আমাদের কাব্যে কালো মেয়ের মর্যাদা কম নয়।

আর এক শ্রেণীর নারীকে আমরা আজকাল প্রায়ই বাংলা কবিতা জগতে দেখতে পাই, সে নারী কৃত্রিম নারী। সে নারী হয় কখনো বিদূষী, কখনো বা চাকুরীজীবিনী। তারা সাধারণতঃ নীরস, নিঃসঙ্গ এবং পুরুষ বা প্রেমিক সম্বন্ধে উদাসীন। এই রীতিপ্রকৃতির মেয়েদের কথা বোধ হয় প্রথম বললেন বুদ্ধদেব বসু[১]। তাঁর বিখ্যাত এলা-দি, অভিজাত ও বিদূষী। দীর্ঘ কবিতাটির শেষ পংক্তিতে এসে এলা-দির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে—'এমনি থেকো—এমনি সুখী ও বিশ্রান্ত, সুন্দর ও সুগন্ধি আর এমনি নিষ্প্রয়োজন।' আমাদের শহুরে সভ্যতা নারীকে এইভাবে কৃত্রিমতায় মূর্তিময়ী করে তুলেছে। এলা-দির সমগোত্রীয়া মেয়েরা প্রগতিশীল সমাজের প্রধান অংশ জুড়ে বিরাজ করছে। কিরণশংকর সেনগুপ্তের সুদেষ্ণাও[২] তেমনি সাজানো সুন্দর আপাতসুখী স্মৃতিনির্ভর। কতিপয় আমলার স্ত্রীদের[৩] মধ্যে সেই একই বিলাসলালিত শূন্যজীবনের ভারবহনের হাস্যকর করুণ প্রচেষ্টা। রাজলক্ষ্মী দেবীর বিদিশা[৪] এখনো সংসারে প্রবেশ করেনি, এখনো গ্রন্থকীটের জীবন তার, পুরুষের প্রতি

১ পৃঃ ৫৫, কবিতার নারী। ২ পৃঃ ৬৩ ঐ
৩ পৃঃ ৬৭ ঐ ৪ পৃঃ ৭৭ ঐ

অনীহা সুপ্ত রেখে তার কুমারীজীবন এবং বড় লোকের মেয়ের যা অবধারিত নিয়তি—'পোষা জানোয়ার নিয়ে সকাল বিকেল আহ্লাদী পুতুলখেলা'। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৌরী[১] নারীত্বে ও প্রগাঢ় যৌবনে পরিপূর্ণা হয়েও গৃহবিমুখ। কারো গৃহিণী হতে সে চায় না। কারও প্রেমিকাও সে নয়। প্রতি পূর্ণিমায় তার যুবতী স্তন নিশ্চয়ই ব্যথা করে ওঠে, কিন্তু তবু কোন প্রকৃষ্ট পুরুষের পীড়নে সে সুখী হতে চায় না। এবং কেন যে সে 'নির্ভর ব্যতীত একা ভ্রমণে ইচ্ছুক' তাও জানা যায় না। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সুধাদি[২], সুজিত সরকারের রঞ্জনাদি[৩], চন্দন চৌধুরীর সুরঞ্জনা[৪] কৃত্রিম ও ব্যর্থজীবনের অধিকারিণীদের প্রতিভূ। এদেরই একধাপ পরে যাদের দেখতে পাই, এই পোড়োজমির যুগে, তারা কলগার্লের নামান্তর। পুরুষকে ভুলিয়ে, নিজের দেহকে নিভৃত পণ্য বানিয়ে, নিজেকে ক্ষয় করে এবং সৎ সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণুতার অন্ধকারকে জমিয়ে তুলে এরা বাঁচতে চায়। এরাই 'ইদানীং বনলতা সেন' অথবা 'কোলকাতার কবিতা সেন'।

এইসব মেয়েদের ভিড়ে আমরা দুঃখী, কর্মী, দরিদ্র মেয়েদের দেখা যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি কর্মে ও পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনে পুরুষের পাশাপাশি স্বগর্বে স্বমর্যাদায় বেঁচে থাকা মেয়েদের। বুদ্ধদেব বসুর এলা-দি কবিতায় পেয়েছি হরিমতি ঝিয়ের সঙ্গত ও বাস্তব রূপ, দেখেছি অমিতাভ দাশগুপ্তের নীহারবালাকে। আদি ও মধ্য যুগ থেকেই বাংলা কবিতায় দুঃখিনী মেয়েদের আবির্ভাব। চর্যাপদে দেখেছি সেই দরিদ্র রমণীকে যার হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ তার ঘরে নিত্য অতিথির আগমন।[৫] চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা তার বারোমাসের দুঃখের ছড়ায় বারবার একটি কথাই বলতে চেয়েছে—'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান'। অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের মা শুধু

---

১ পৃঃ ৮১, কবিতার নারী। ২ পৃঃ ৮৬ ঐ ৩ পৃঃ ১১০ ঐ
৪ পৃঃ ১২০ ঐ ৫ চর্যাপদ ৩৩

দুঃখিনী নয়, বনবাসিনী। চর্যাপদে আছে নারী পাটুনী, অন্নদামঙ্গলে আছে ঈশ্বরী পাটুনী। 'ঈশ্বরী' সম্ভবত নারী। যে বিশ্বে ওরা কাজ করতো, সেই বিশ্বের রূপ আজ পাল্টে গেছে। ফণী বসু তাই তাঁর কবিতায় একজন অফিস ফেরৎ রমণীকে দেখিয়েছেন। চলন্ত ভিড় বাসের একটি হাতল আঁকড়ে ঝুলে থাকা সেই নারী আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের[১] মিছিলের মুখের নারীকে ভিন্নার্থে দেখতে পেলেও এরা উভয়েই এ যুগের নারী এবং উভয়েই ভিন্নার্থে হলেও বিদ্রোহিনী। মহিলা কমরেড আর আমাদের সমাজে অভাবিত নয়, অভাবিত নয় মিনতি গোস্বামীর কবিতার[২] দীপালি রায়। সমীর রায়ের কমরেড বোনকে আমরাও হয়তো তেমন করে দেখিনি, কিন্তু সসম্ভ্রমে শুনেছি তার নাম, মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাকে।

কিশোরী প্রীতি, কিশোরী পূজা বাঙালী কবিদের আর একটি প্রাণধর্মের স্বভাবচরিত্রের পরিচয়বাহী। শেকসপীয়রের জুলিয়েট চির-কিশোরী কিন্তু তার প্রেম ও কার্যাবলী প্রায় পরিণত মহিলার মতো। বিদ্যাপতির রাধা বালিকাবয়সী থেকে কিশোরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেহের দীপ্তি ও বুদ্ধির দীপ্তিতে সে অতুলনীয়া। তাকেও ধীরে ধীরে যুবতীসম্মত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এত প্রাণ এত আবেগ, দুঃখ ও সুখ উভয়ের প্রতিই এমন প্রবল আভীপ্সা ও অভিক্ষেপ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, এমন কি গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যেও দেখা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকাও বালিকা ধরম ছেড়ে কিশোরী ধরমে পৌঁছে গিয়ে আপন চরিত্রের খরদীপ্তি নিভিয়েছে হঠাৎ বিচ্ছেদের অপার অশ্রুসলিলে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা কিশোরী হয়েও কিশোরী নয়। গোপন ভালোবাসার আনন্দ ও বেদনার অভিঘাতে তার দেহ ও মন স্বল্প কালেই পরিণতি লাভ

করেছে। মাতৃত্বের পরিণতি।

সত্যেন্দ্রনাথ,[১] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়,[২] সুবো আচার্য[৩] প্রভৃতি কবিদের কবিতায় স্বপ্ন-রোমান্স-ঘেরা কিশোরীকে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি দেবারতি মিত্রের কবিতায়[৪] এক ঝাঁক বাস্তব বিশ্বের কিশোরীকে। কিশোরীকে ঘিরে কবিদের মনের উল্লাস, কাব্য চেতনার বিকাশ, সুখ-কল্পনার উৎসার যেমন সেকালেও হয়েছে তেমনি একালেও হচ্ছে। কিশোরীর দেহ মন ঘিরে এক পবিত্রতার আভরণ চিরদিন থেকে গেছে, থেকে গেছে এক অজানা ও নতুন বিস্ময়ের আবরণ। তবে একালের কবিতায় সেকালের মতো 'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী'-রূপ সহজিয়া তন্ত্রসাধনার ভজনাবৃত্তান্ত নেই।

বাঙালী কবিরা বাঙালী নারী নায়িকাদের নিয়েই ব্যস্ত। এবং সেটাই স্বাভাবিক। স্বদেশিনী বিনা আশা ও তৃষা কি মেটে? তবু ভিন্নরুচির কবি নিশ্চয়ই আছেন। তাই ভিন্ন সমাজের ও ভিন্ন দেশের নারীও আছে বাংলা কাব্যে। যেমন ঘনিষ্ঠতার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে সাঁওতাল রমণী, সাঁওতাল যুবতী। আমাদের সংকলনের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক[৫] বা কানাই সামন্তই[৬] শুধু নন, অনেক বাঙালী সাহিত্যিক সাঁওতালী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প লিখেছেন তাদের নিয়ে। সাঁওতালী গানের ও কবিতার অনুবাদ করে বনজ সৌন্দর্য ও রসপিপাসা মেটাতে চেয়েছেন আধুনিক অনেক কবি। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি অনুবাদ—

এই কুঁয়ারি কাজল কালো
জবা গুঁজেই চুলে
ঝলক ওঠে ঝলক নামে;
সোনার শাঁখা পরেছে হাতে।

১ পৃঃ ৩৭, কবিতার নারী ২ পৃঃ ৫৮ ঐ ৩ পৃঃ ১০২ ঐ
৪ পৃঃ ১০৫ ঐ ৫ পৃঃ ৪১ ঐ ৬ পৃঃ ৫২ ঐ

মালাও দোলে গলায়।
এই কুঁয়ারি রাজ্যের রূপ জড়ো করেছে গায়
অঙ্গখানি নরম ঝান্নু আম
দু'টুটি বুক বিনোদ বেল ফল
সারাক্ষণ ভালোবাসবো ক্লান্তিই মানবো না।[১]

ভিনদেশী নারীর প্রতি আগ্রহ কোন উদার আন্তর্জাতিক মনোভঙ্গির ফলে না ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ফলে তা সঠিক বলা যায় না সব ক্ষেত্রে। মধুসূদন তাঁর দুই বিদেশিনী স্ত্রী রেবেকা বা হেনরিয়েটাকে কোন প্রিয় বাঙালী নামে ডাকতেন কি না জানি না। রবীন্দ্রনাথ আন্না তরখড়কে বাঙালী 'নলিনী' নামে ডেকেছিলেন, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো হয়েছিলেন 'বিজয়া'। 'বিজয়া' রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যে 'হে বিদেশী ফুল' রূপে দেখা দিয়েছেন। অবশ্য বাস্তবের বহু বিদেশী ফুলকেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাম দিয়েছিলেন, নামগুলি অমর করে রাখবার জন্য কবিতা রচনা করেছিলেন। যথা ইস্পানি, নীলমণি, হিমঝুরি, সোনাঝুরি প্রভৃতি।[২] কবি সত্যেন্দ্রনাথ গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা অনুবাদের দ্বারা বিদেশী নারীকে বাংলা কাব্য-অঙ্গনে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। শুধু তাই নয় মলয়, মিশর, জাপান, গ্রীস, ইহুদী, কাফ্রি, পারস্য, আরব এবং ভারতের রমণীদের তুলনা করে দেখে নেওয়ার, জেনে নেওয়ার যেন সুযোগ করে দিয়েছেন পাঠক-পাঠিকাদের। আমরা সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল' কাব্যের 'নারী বন্দনা' নামক কবিতাটি[৩] সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি। কবিতাটি কোন্ বিদেশী কবির রচনা তা সত্যেন্দ্রনাথ বলেন নি।

নারী বন্দনা

মলয় উপদ্বীপ

ললাট তোমার সিত পক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ,
আদ-ফুটন্ত যূথিকার কলি স্ফুরিত নাসার ছাঁদ ;
রাঙা দুটি গাল, পুষ্ট রসাল, ধরেছে মাত্র রং,
লেবু-গন্ধের তৃণের মতন কচি আঙুলের ঢঙ !
কুন্তল ঘন গন্ধ মগন গুবাক-ফুলের বাঁধি,
জোড়া ভুরু যেন আকাশের পাখী চিত্রে রেখেছে বাঁধি !
নয়নে তোমার শুক্র তারার চির উজ্জ্বল বিভা,
পেকে-ফেটে-যাওয়া ডালিমের মত ওষ্ঠ অধর কিবা ;
তিনটি রেখায় নিবিড় লেখায় শোভিত কণ্ঠ তায়,
ক্ষীণ কটি যেন ফুলের বৃন্ত হিল্লোলে দোলে হায় !

মিশর

রমণীর মণি, মমতার খনি, রাজার দুলালী ধনী,
অমা যামিনীর তিমির জিনিয়া কালো তব কেশ গণি ;
কালো সে নিবিড় ফল-মণ্ডিত জম্বুবনের চেয়ে,
পৃষ্ঠ তোমার—স্কন্ধ তোমার—ললাট তোমার ছেয়ে !
কুসুম স্তবক স্তন দুটি তব বিমুখ বিরাগ ভরে
তীক্ষ্ণ উজল দশন অমল হীরকে মলিন করে ;
লঘু লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলে,
তোমারে ঘিরিয়া যেন বসন্ত নব পল্লব খোলে !

জাপান

মূল-পাপড়ির জড়িমা-জড়িত আধ-বিকশিত আঁখি
উজ্জ্বল যেন ছুরির মতন, শান্ত যেন গো পাখী !

সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তার ;
পাণ্ডু বদন, পাণ্ডু বরণ, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি !

গ্রীস

কপোল তোমার গোলাপের মত, দুধে-আলতার রং,
নিশ্বাস মধু, সরল নাসিকা, — নহে গরুড়ের ঢং ;
দীঘল আঙুল, ক্ষুদ্র চরণ, উজ্জল মাঝারি চোখ,
জোড়া নহে ভুরু,—ঈষৎ বক্র, হাসিতে তুষ্ট লোক ;
মগ্ন মূরতি সুন্দর অতি, ভূষণে তেমনি শোভা,
তনু কমনীয়, সুখ নমনীয়, নিখিল পরান লোভা !

ভারতবর্ষ

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে তনু ছায়,
আধ-বিকশিত সোনার কমল উজলিছে মহিমায় ;
পরশে তাহার শিরীষ-সুষমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠি, হরিণ-নয়না, হাসে ভাষে সদা লাজ।

ইহুদী

তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাস্‌পাতি হতে মিঠে,
কিবা সর্বৎ—কিবা সে সরাব অধর অমৃত ছিটে !
তরুণ তরুর ছন্দ তনুর, নীল কুন্তলজাল,
হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল !
লুকায়ে ও বুকে উৎসুক মুখে ও কি মৃগশিশু দুটি ?
আবরণখানি করিলে মোচন—ওরা কি পালাবে ছুটি ?
স্ফটিকে গঠিত অঙ্গ তোমার, অমৃত-পাত্র কায়,
কোন্ রস তাহে আছে যে অভাব ভাবিয়া পাই না হায়

য়ুরোপ ঃ মধ্যযুগ

অমলবরণী নবনীত জিনি—জিনি বরফের গুঁড়া,
কোমল চিকন চিকুর সোনালী জিনি কাঞ্চন-চূড়া!
অধর অরুণ, হাসিটি তরুণ, করুণ নয়ন দুটি,
ক্ষীণ তনু—তাজা, পরিক্ষীণ মাজা,— তবু সে পড়ে না টুটি।
বুকের বসন তুলিয়া ধরিয়া আছে দুটি আখরোট,—
সোহাগ-ভিখারী আছে আগু বাড়ি সাথে আছে রাঙা ঠোঁট

কাফ্রি

ওই কালো রূপ অমৃতের কূপ সুষমার খনি কালো,
শ্যাম পল্লব জিনিয়া পেলব কালো আমি বাসি ভাল;
নিবিড় রূপের স্নিগ্ধ গাঢ়তা স্বপনে ডুবায় আঁখি,
স্নিগ্ধ শ্যামল বদনে উজল চঞ্চল আঁখি-পাখী!
ললাট-ফলক বেড়িয়া অলক খেলা করে বায়ু ভরে,
কোমলে কঠোর—সংহত তনু কাফ্রির মন হরে।

পারস্য

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু ধনু কে গো করেছ যোজনা নয়ন-পক্ষ্ম-শরে!
গুম্ফবিহীন ওষ্ঠে চিবুকে নীল সুষমার লেখা,
দীঘল সরল তনু নির্মল, চোখে কজ্জল-রেখা:
কালো তিল—খুঁটে কুড়ায়ে তুলেছে, ফুটায়ে তুলেছে রূপ,
অমল চরণে লুন্ঠিত কত মুকুট-শীর্ষ ভূপ!

আরব

বেতসী জিনিয়া নমনীয় তনু,—কিশলয় জিনি রুচি:
বদন-ইন্দু ঘিরি কুন্তল রেখেছে যামিনী রচি!
কজ্জলহীন কাজল নয়ন রেশমী পক্ষ্মে ঘেরা,
কান্ত কোমল ক্লান্ত সে দিঠি সকল দিঠির সেরা:

অধর অরুণ দশন তরুণ প্রবালে মুকুতা পাঁতি;
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু নিতম্ব, জোড়া ভুরু প্রাণঘাতী!
এক বৃন্তের দুটি দাড়িম্ব হৃদি 'পরে হৃদি-লোভা,
লঘু পাণি, লঘু চরণ, আঙুলে হেনার রঙীন শোভা।

বিদেশিনীদের জানার দেখার ঔৎসুক্য কার নেই? 'নারী-বন্দনা' নামক ঐ মূল কবিতাটি যিনি রচনা করেছিলেন তাঁর যেমন ছিল, যিনি অনুবাদ করেছিলেন সেই সত্যেন্দ্রনাথেরও তেমনি ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালীদের কাছে অন্যতম প্রিয় কবি। নারীবর্ণনা, নারীবন্দনা, প্রেমাগ্রহ তাঁর রচনার মধ্যে সর্বত্রই সুস্পষ্ট। এই বিদেশিনী আগ্রহ আজও বাঙালী কবিদের মধ্যে একান্ত। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র বিদেশিনীরা শুধু পৌরাণিক নয়, বাস্তবিকও বটে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জুলেখা, কমল তরফদারের আথিনারাও তাই বাংলা কবিতার স্বর্ণাসনে সমাদরে বসার সুযোগ পেয়েছেন। এই রকম অনুরাগী সুযোগ দানের ইচ্ছা রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ বাঙালী কবিদের মনে ছিল, আছে এবং থাকবে। এও এক ধরণের বিশ্বৈকবোধ। অতীতের যাযাবরী ও একালের হিপিনীরাও বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে। এইভাবে বাংলা কবিতা নারীচর্চায় একটি লক্ষণীয় বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছে॥

সুতনুকা

সুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদীন নম লুপদখে ।

শবরী ☐ শবরপাদ

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবর বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

চণ্ডী ☐ জয়দেব

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয় দন্তদংশ
দোর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবান
চাণ্ডালকাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্ত ॥

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্রূ-
র্যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পী।
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায় যূনাং
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥
ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়-স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥
বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি—
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিল প্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥
দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জন-মনোরমা বিজিত-রম্ভমূরুদ্বয়ম্ ॥
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা—
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥

★

নির্দয়ভাবে দংশন করো দন্তে তোমার
ভারি স্তন দিয়ে পিষে ফেলো বেঁধে বাহুতে
আমাকে শাস্তি দিয়ে সুখী হও, কিন্তু মানিনী
নিষ্ঠুর ঐ কামদেবতার বাণাঘাতে যেন মৃত্যু না হয় ॥
কালকেউটের মতো তুই ভুরু ভঙ্গিমা
মুগ্ধ করেছে যৌবনে ভরা এই দেহ মন—
হে নিরুপমা! তোমার ঠোঁটের অমৃত শুধু
ভয় থেকে আজ অভয়ে যাবার মূলমন্ত্র ॥
তোমার এমনি বৃথা অভিমান—বড়ো ব্যথা দেয়
কথা কও রাধা, মধুর আলাপে জুড়াও তাপ

সুন্দরী, তুমি করুণার চোখে একবার চাও
ডাকোনি, তবুও এসেছি—আমাকে ফিরিয়ে দিও না ॥
বাঁধুলি ফুলের মতো লাল ঠোঁট, মধুকের মতো স্নিগ্ধ কপোল
নীল পদ্মকে ম্লান করা চোখ—নাসা তিল ফুল
দন্তে কুন্দকলির আভাস, প্রিয়তমা হে, অতনু তোমার
অমনি মুখের করুণা পেয়েই এখনো করছে বিশ্ববিজয় ॥
দৃষ্টিতে তুমি মদালসা, ওই বদন ইন্দু-সন্দীপনী
হেঁটে যাও যেন মনোরমা, আর রম্ভার চেয়ে সুন্দর উরু
রতিকৌশলে কলাবতী তুমি—দুই ভুরু যেন চিত্রলেখার
মর্তে থেকেও তন্বি তুমি, অঙ্গে ধরেছ অপ্সরাদের ॥

অনুবাদ : রত্নেশ্বর হাজরা

তীনভুবনজনমোহিনী □ বড়ু চণ্ডীদাস

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥
তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী ॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥

দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জানী
নপুংসক আইহনের রাণী ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুঝিল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

বয়ঃসন্ধির রাধা □ বিদ্যাপতি

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল ॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করল পরগাস ॥
মুকুর লই অব করত সিঙ্গার।
সখী পুছই কৈসে সুরত বিহার ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত অপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ॥
মাধব পেখল অপরূব বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
দুহু একযোগে ইহকে কহ সয়ানি ॥
★
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পীড়য় অনঙ্গ ॥

সে পুন ভৈ গেল বীজকপোর* ।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর ॥
মাধব পেখল রমনী সন্ধান ।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান ॥
তনু শুক বসন হিরদয় লাগি ।
যে পুরুখ দেখব তকর ভাগি ॥
উরহি লোলিত চাঁচর কেশ ।
চামর ঝাঁপল কনক মহেশ ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি ।
সুপুরুখ বিলসয় সে বরনারি ॥



দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন ।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥
আবে মদন বঢ়ায়ল দীঠ ।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ ॥
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয় ।
রাধারতন জৈসে ভুয় হোয় ॥

---

* গোড়া নেবু ।

কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা □ বিদ্যাপতি

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারিয় গেলি॥

ধনি অলপবয়সী বালা
জনি গাঁথলি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ ন পূরল
রহল মদন জ্বালা॥

গোরী কলেবর নূনা
জনি কাজরে উজোর সোনা।
কেশরী জিনি মাঝ ক্ষিণি
দুলহ লোচন কোনা॥

ঈষত হসনি সঞে
মুঝে হানল নয়নবানে।
চিরে জীব রহু রূপনারায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

বররঙ্গিনী □ গোবিন্দদাস

সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিনী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জনু তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥

সজনি, সো ধনি চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর ॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
তুহুঁ পাহুক করি নেল ॥
চিত নয়ন মঝু তুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ □ জগদানন্দ

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী ॥
ঘন-গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী ফুল মাল রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জনগতিহারী ॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিনী করকঙ্কন মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী ॥

নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিদমন-দমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥
দশন কুন্দ-কুসুম-নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দনসুখকারী ॥
মণিমাণিক নখে বিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থলজলরুহ
চরণকি বলিহারি ॥

কোই নহি রাইক সমানা □ শশিশেখর

তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেহ রুচি বসন পরিধানা।
যব যুবতীমণ্ডলী পান্থ মাঝ পেখলি
কোই নহি রাইক সামানা ॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপ গুণ সায়রী স্তজিল ইহ নায়রী
ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি ॥

দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিনী
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
নিমেষে নব নৌতুনা সুবেশা মৃগলোচনা
অতএ তুঁহু উহারি অনুরাগী ॥
রতন অট্টালিকা উপরে রহু রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ পানি।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
লাগি রহু শশিশেখর বাণী ॥

রাধারূপ ☐ অনন্তদাস

ধনি কনক-কেশর-কাঁতি
বনি বদন-বিধুক ভাঁতি ॥
জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া-মধুর ভাষ ॥
তাহে চিকুরে কবরী ভার।
হিয়ে লম্বিত মাণিক হার ॥
কুচ কনক-দাড়িম শোহ।
মন-মোহন-মন মোহ ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি।
তাহে নীল বলয়া মণি ॥
নখ শরদ-পূর্ণিমা-চাঁদ।
তনু হেরি অরুণ কান্দ ॥
কটি কেশরি জিনি খীন।
তিন রেখ ত্রিবলি ভীন ॥

স্থল-পঙ্কজ পদতল।
মণিমঞ্জির ঝলমল ॥
হেরি তাহে অনন্তদাস।
কর সেবন অভিলাষ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ □ বাসুদেব ঘোষ

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে
পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥
এ ঘর জননী ছাড়ি
মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ
লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস ॥
পুরুবে নন্দের বালা
যবে মধুপুর গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া
নিজ তত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে।

চাঁদমুখ না দেখিব
আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব
তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

সীতা □ কৃত্তিবাস ওঝা

ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে॥
সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দন তিলক শোভে কপালের ভাগে॥
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্ক বিম্বফল জিনি অতি শোভাকর॥
পরিধান নানা রত্ন রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগণে।
মূর্ছিত হইল সবে সীতা দরশনে॥
জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূর্চ্ছিত।
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত॥
কেহ ভাবে আইসেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি॥
অন্যে বলে ত্যজি বুঝি বিষ্ণু বক্ষস্থল
লক্ষ্মী অবতীর্ণা হৈল দেখিতে ভূতল॥

কেহ বলে আপনি সাবিত্রী মূর্তিমতী।
কেহ বলে বশিষ্ঠ গৃহিনী অরুন্ধতী॥
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে
অন্য লোক কত তর্ক করে নানা স্থলে॥
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরা সুতা সীতা কৃশ কলেবরা॥
উপস্থিত হইলেন সভা বিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান॥

গৌরীর রূপ □ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
অন্য বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল-সঙ্কাশ :
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
গৌরীর দশনরুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বিচি
মলিন হইলা লজ্জাভরে।
হেন লখি অনুমানে ঐ শোক ভাবি মনে
পাককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
অধর বন্ধুকবন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
অতসী কুসুম তনু ভুরুযুগ কামধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন॥

নাসিকা উপরে মোতি হীরক জড়িত শ্রুতি
বদন-কমলে ভাল সাজে।
তবে তুলা দিতে পারি যদি অতি মনোহারী
শোভে তারা সুধাকর মাঝে ॥
গৌরীর বদন শোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চান্দ নাহি দেয় দেখা।
মালিন্য তার ঐ শোকে না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা ॥
শ্রবণ-উপর দেশে হেম মুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে যেমন বিজুরি সাজে
পরিহরি চপলতা দোষে ॥
মুকুতার হার গলে সিন্দুর চন্দন ভালে
ভুজে শঙ্খ কঙ্কণ কেয়ূর।
অসিত চামর কেশে কুণ্ডল শ্রবণ-দেশে
পদযুগে সুনাদ নূপুর ॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ চিন্তেন পর্বত-ভূপ
কারে করি এই কন্যা দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ করিয়া পাঁচালী বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

গোয়ালিনী বেশে মনসা ॥ বিজয় গুপ্ত

জাত দিয়া দৃঢ় করি বান্ধিল কবরী।
চন্দন-তিলক পরে পরমা সুন্দরী ॥
নাসা যেন তিল ফুল জিনিয়া চাতুরী।
মুখের চাঁদেতে চন্দ্রের রূপ করিল চুরি ॥

কনকচম্পক যেন দেখিতে কলেবর।
হস্তিশুণ্ড যেন বাহু অতি মনোহর॥
দাড়িম্বের বিচি যেন দন্ত ঝলমল।
দেখিলে তরুণ জনে হইবে বিহ্বল॥
চকিত চকোর দুই নয়ন তাহার।
জিনিয়া বাঁধুলী ফুল অধর সুন্দর॥
দেখিয়া তাহার শোভা কেবা নাহি ভোলে
খঞ্জন নয়ন দুই সরোবর-কোলে॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়।
কনক নূপুর তুলিয়া দিল দুই পায়॥
অধরে তুলিয়া দিল খদিরের রস।
পারিজাতের মালা পরে দেখিতে রূপস॥
কাঞ্চনের ঝরা দিল দুই হস্তে তুলি।
দুই হস্তে তুলিয়া দিল বক্ষের কাঁচলি॥
সুবেশ করিয়া চলে জয় বিষহরী।
দধির পসরা লইয়া চলে একেশ্বরী॥
ধন্বন্তরি বধিতে চলিলা বিষহরী।
শঙ্কুর নগরে দেবী চলে তাড়াতাড়ি॥
কপটে চলিল পদ্মা গোয়ালিনীর ছান্দে।
এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর প্রবন্ধে॥

সতী ময়না □ দৌলৎ কাজি

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী॥
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ॥

কাঞ্চন-কমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে ।
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে ॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে ।
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন ।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ ॥
পুষ্প শর জিনি নাসা শোভে বিদ্যমান ।
লজ্জা এড়ি অন্তর্গত রহে কামবাণ ॥
অধর বান্ধুলি রুচি কত মধু ভাষে ।
কুন্দ-দশন-পাঁতি মুকুতা প্রকাশে ॥
ঘনচয়রুচি কেশ শিরেত শোভন ।
প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির শরণ ॥
সুবর্ণ কর্ণিকা কর্ণে মাণিক্য নেপুরে ।
দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রমার কোরে ॥
মন্মথ-মথিত যে সম্পূর্ণ শ্রীফল ।
নিবিড় নির্মল কুচ মুকুল কোমল ॥
নাভি কুণ্ড নহে রতি ক্রিয়ার সর্বস্ব ।
মদনের বিভা হেতু মঙ্গল কলস ॥
নির্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান ।
ভরমে ভ্রমর পাঁতি ধরএ যোগান ॥
চরণ যুগল নব পল্লব ললিত ।
পদে পদে ঋতুপতি যায় পৃথিবীত ॥
সুবেশ লাবণ্য প্রতি অঙ্গে কান্তি করে ।
কেবল সোহাগ সুধা অন্তরে উদ্গারে ॥
কত কত কুটুম্ব বটরী প্রজাপতি ।
নিজ গুণ প্রকাশিতে সৃজিলা যুবতী ॥

প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস সুমতি।
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।
সর্বকলাযুতা সতী নূতন যৌবন।
স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন ॥

পদ্মাবতী □ আলাওল

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত ॥
সুগন্ধী শ্যামলভার ধরণী ছুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল ॥
কিম্বা মেঘারম্ভ যোগে হইল অন্ধকার।
বিধুন্তুদ আসিল না চন্দ্র গ্রাসিবার ॥
দিবস সহিতে সূর্য হইল গোপন।
চন্দ্র তারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন ॥
ভাবিয়া চকোর-আঁখি পড়ি গেল ধন্ধ।
জীমূত সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥
হাস্য সৌদামিনীতুল্য কোকিলবচন।
ভুরূযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত-গগন ॥
নয়ন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে ॥
সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন হেতু করয় লহরী ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মোহ অন্ধকার মন-দৃষ্টি পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কার বহে সমসর ॥

দ্বিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবনমোহন।
এক গুণে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥
বিরাজিত কুসুম-গ্রথিত মুক্তাহার।
সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহাশুদ্ধ পথ॥
সেই পন্থে বাটওয়ার বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলকাপাশে বাক্ত রক্তাচন॥
কিবা কবরীর মাঝে স্বর্ণরেখাকার।
যমুনার মাঝে যেন সুরেশ্বরী-ধার॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত॥
কিবা মুখচন্দ্র আঁখি-অরুণে দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিতেছে কিবা তিমিরের হিয়া॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থ যাইবার।
রুধিরমিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার॥
কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য আশে।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে॥
ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর॥
বালক চান্দ্রমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন॥
কি মতে বলিব ভাল তুলনা সে অঙ্গ।
সকল অঙ্ক চন্দ্রমা ললাট নিষ্কলঙ্ক॥
কুন্তু রাহু করে চন্দ্রে আলোকগরাস।
মোহন ললাটে চন্দ্র সতত তরাস॥
স্বেদবিন্দু কপালেতে উদয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভাতৃ-সম্ভাষণ॥

যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটে ত হইব সংযোগ নিশ্চয়॥
কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা সন্ধান।
যাহারে হানয়ে বালা লয় যে পরাণ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম শরধনু॥
ভুরু চাপে গুণাঞ্জন বানকটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য॥
কদাচিৎ গগণে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরুভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ তনু॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥

[অংশ]

দ্রৌপদীর রূপবর্ণন □ কাশীরাম দাস

আদি পর্ব

১

পূর্ণ সুধাকর হইতে প্রবর
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্র যুগমীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূলতা দেখি পায় ব্যথা
মদনের শরাসন॥

প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দুর চাঁচর ভালে ॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিল মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝনঝন,
চরণে নূপুর হংস
জঘন সুন্দর বিহার কন্দর
স্বর্ণ কাঞ্চি অবতংস ॥
রামরম্ভা তরু চারু যুগ উরু
দেখি নিন্দে যত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ ঈশ
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি ॥
অতি সুকোমল শরীর অমল
কমলে গঠিত অঙ্গ
ভারের কারণ হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥

কমল বদন কমল নয়ন
কমল গঞ্জিত গণ্ড
দ্বিকর কমল কমলাংঘ্রিতল,
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায় যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত ধায় চতুর্ভিত
কমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে কমলার অংশে
হৈল কমলসম্ভূত।
কমলা বিলাসী, বন্দি কহে কাশী
কমলাকান্তের সুত ॥

বিরাট পর্ব
২

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিনী চন্দ্রের রামা, রতিসতী তিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, যেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে ॥

মৃগনেত্র জিনি আঁখি কামশর তুল্য দেখি
বাজিলে মরিবে কামরিপু ।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব গণি,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু ॥
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর ।
শুক চঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ যিনি বিষধর ॥
তোমার নিতম্বে কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ ।
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী কিবা চারু চকোরিণী
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
হের দেখ বরাননে তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখাসহ ।
কে দেবী নামিলে তুমি কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গযোগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতি,
বিনা দেব দিক্‌পালগণ ।
তব অঙ্গ দরশনে, মোহে গেল নারীগণে
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥

দেবসভায় বেহুলা ষষ্ঠীবর

করজোড়ে নমস্কার প্রদক্ষিণ সপ্তবার
অন্তে অন্তে শিরেত বন্দিয়া ।
সচকিত মন করি নৃত্য করে সুন্দরী
আওয়া সরাতে ভর দিয়া ॥

ক্ষণে নানা গীত গায়　　কর্ণে নানা তাল বায়
ইঙ্গিতে কটাক্ষে কহে বাত।
বিপুলার রূপ দেখি　　সর্ব দেব হইলা সুখী
রূপ দেখি ভোলে ভোলানাথ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান　　গায় বস্ত্র একখান
অঞ্চলে না ঘুরে দুই স্তন।
বিপুলার পানে চাইয়া　　মুখেত কাপড় দিয়া
কৌতুকে হাসয়ে দেবগণ ॥
শ্রীষষ্ঠীবর কবি　　কণ্ঠে ভারতী দেবী
সরস্বতী যারে দিলা বর।
বিপুলার নৃত্য দেখি　　দেবগণ হইলা সুখী
রূপ দেখি ভুলিলা শংকর ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন □ ভারতচন্দ্র রায়

এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয় ॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥
বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার;
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত-পাঁতি তার॥

অন্নদার মোহিনীরূপ □ ভারতচন্দ্র রায়

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ-কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেন বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু;
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর-রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলি চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে;
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥

কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরা ভ্রমরী অনিবার ॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয় হইয়া ;
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥

ষোড়শী ভব-অঙ্গনা □ মহাতব চাঁদ

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা ।
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা ॥
ধনুসদৃশ ভ্রূলতা, ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুরবচনা ।
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নব পয়োধর,
হেন কর্ণপূর, মনোহর আভরণা ॥
কাঞ্চিযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলিশ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধায়িনী, রক্তাম্বর-পরিধানা ।
পাশাঙ্কুশ যুগ্ম করে, ধনুর্ব্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে, ঊরু কদলী-তুলনা ॥
নিম্ননাভি সরোবর, শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বন্দিত চারু চরণা ॥
তাম্বুলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্ফ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ।
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, জবাকুসুমবরণা ।
নাশ করে দূরদৃষ্ট, মুক্ত কর ভবকষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ষোড়শী ভব-অঙ্গনা ॥

নায়কের উক্তি □ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছে শেষ ।
কিসে শীত হিতকর, শুন সবিশেষ ॥
রূপ, গুণ, হাবভাব, তোমার যে আছে ।
যারা তার অনুরূপ, চুরি করিয়াছে ॥
সেই সব চোর ধরি, শীত মহারাজা ।
একে একে সকলেরে দিতেছেন সাজা ॥

ডালিম হরিল তব, পয়োধর ভাব ।
সেই হেতু শীতে তার বিপরীত লাভ ॥
ভয়েতে শিহরে সদা, কাঁটা কলেবরে ।
আপনি আপন পাপে, বুক ফেটে মরে ॥
আর দেখ পদ্মকলি, অলি মনোলোভা ।
হোরেছিল প্রাণ, তব কুচকলি শোভা ॥
নীহার করিল তারে অশেষ আঘাত ।
ফুটিবে কি উঠিবে কি, সদলে নিপাত ॥
পাছে ফের ঘটে ফের, মরি মনোদুখে ।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে ॥

কটির ক্ষীণতা হরি, হরি হরি বন ।
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন ॥
করী অরি তব অরি, হরি নাম যার ।
এখন হয়েছে তার, হরিনাম সার ॥
এ সময় কেন প্রাণ, মান কর আর ।
দুলাইয়া ক্ষীণ কটি, হাঁটো একবার ॥
কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে
রতি হেরে রতিপতি, পদানত হবে ॥

তব উরু গুরুভার, হরি রম্ভা তরু।
শিশিরেতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সরু ॥
কেমন কর্মের ভোগ, নাহি যায় বলা।
শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা ॥
পদচোর পদে নাই, মরিল বিপদে।
প্রেমময়ি, প্রেমদাসে, রাখ প্রাণ পদে ॥

রূপ চুরি করি হেম, প্রেম নাহি পায়।
হিমে তারে, হিম বলি, নাহি তোলে গায় ॥
বন্দিরূপে বদ্ধ হয়ে, আছে কারাগারে।
আমারে ভূষিত কর, প্রেম-হেমহারে ॥

[অংশ]

তিলোত্তমা □ মধুসূদন দত্ত

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিকপাল দলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
 আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যাম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;

খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা !
গড়িলেন বাহুযুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস আনন্দ বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেবশিল্পী গড়িলেন মেরুশৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারারতন উষার ললাটে,
তেজপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ববিমোহিয়া !
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুলশর, নয়নে অর্পিলা।
দেবশিল্পী বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে, এ সবারে ত্যজি,—

হরিতালে শিল্পিবর রাঙ্গিলা স্থতনু !
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধুরব ; কিন্তু বীণাপানি
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীকুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী !
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—স্থমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী !
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
স্থস্বনে ! মোহিত কামে মুবজামোহন,
মনে মনে ধনপ্রাণ সঁপিলা বামারে !
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে !
মহাস্থখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে !
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে ! সাবাসি, ওহে দেবশিল্পি গুণি !
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে !
হেন কালে, —বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ;—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী ;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,

ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে!
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেবশিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"

প্রমীলা □ মধুসূদন দত্ত

রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বনআভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!
সাজিলা দানববালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীরমদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!

নিমন্ত্রণ □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে পড়ে, যেন এককালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে ;
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম,—
থাক সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।

তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।

সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়,—
যে কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরালে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।

গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।

একগুচ্ছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে ;

বৈকালে গাঁথা যূথিমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে ;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মিলিবে হৃদয় মাঝে।

এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি রুমাল-টানা
অরুণবরণ আম এনো গোটাকত।
গন্ধ জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয় ;
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাবা ;
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।

তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে-কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদর বিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও

যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে ;
ভাবিছ বসিয়া সহাস ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদু সংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, না হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো ;
বরদানে, দেবী, না হয় হইবে বাম ;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এস একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে ;
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তারপরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা ;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তারপরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে ;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোল ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।

কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে।
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিক্কন চুলে।
তাম্র থালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি ;
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি,—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ, ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।

মনে আসে, তুমি পুব-জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে ;
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।
এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।

পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিণরিণ,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরী ধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

সুন্দরী কে□দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কে সে বল সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক?
ভ্রূ দুটি যার টানা টানা?
নাসিকাটি বাঁশি-পানা?
ওষ্ঠ দু'টি রাঙা রাঙা? পটলচেরা চোখ?
নাকটি কিন্তু কুঁচিয়ে রাখে,
ওষ্ঠ দুটি বাঁকিয়ে থাকে,
চাহনিতে বিরক্তি, আর কথায় কথায় 'রোখ':

আমি বাহির থেকে এলে,
মূর্তি যেন বাঘে খেলে,
ঝগড়া একবার বাধ্‌লে পরে যেন 'ছিঁনে জোঁক':
অনেক ভেবে চিন্তে তবে,
যাহার কাছে যেতে হবে,
কৈতে কথা প্রতি পদে গিলতে হয় ঢোঁক:

নয় ক নিজে 'কোন কর্ম্মা',
অন্যের উপর 'অগ্নিশর্ম্মা',
আমার চেয়ে বেশী আমার টাকার দিকেই ঝোঁক ;
হৌক না তাহার গৌর বরণ,
হৌক না তাহার নিখুঁত গড়ন,
আমার চক্ষে নহে সে ত সুন্দরী স্ত্রীলোক।

২

তবে কে সে সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ?
সেই সে যাহার বক্ষে প্রীতি,
চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি,
বাক্যে যাহার কল্যগীতি—ঝরে পুণ্যশ্লোক ;
মুখে পবিত্রতারাশি,
ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি,
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক ?

হাস্যে আমার সখী সমা
ক্রোধে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা,
রোগে দুঃখে চিন্তাজ্বরে—হরে সর্ব্বশোক ;
দৈন্যে আমার উপকারী
পাপে আমার পাপহারী,
তাকে অসুন্দরী বলে কে সে আহাম্মক ?

তারেই বলি দেখতে ভালো,
তাহার রূপে জগৎ আলো,
তাহার রূপে মুগ্ধ আমি—যেমনই সে হোক ;
নাই বা হল গৌরবরণ,
নাই বা হল নিখুঁত গড়ন,
তারেই বলি সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ॥

ওফিলিয়া ▫ চিত্তরঞ্জন দাশ

বর্ণহীন শুভ্র-শোভা ! ম্লান শরতের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন প্রভাত-শিশির !
অনন্ত সৌন্দর্যভরা কবি হৃদয়ের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন স্বপন নিশির
ওফিলিয়া ! মৃদু প্রেম তব মরমের
কুসুম-কোরক সম সুন্দর সুধীর
শতছিন্ন, পরশিযা ক্ষিপ্ত প্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন নিশির !
দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক পরে সুন্দর তরুণ
সুবর্ণ শৈশব স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া
চির অস্তাচলে গেল জীবন অরুণ ।
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনী
সুধায়োনা চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী !

কিশোরী ▫ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতা পরা পায়ের লোভে কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল ।
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছরাঙা চায় শিকার ভুলে, কুহরে পিক অনর্গল ;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা বুকে আঁকে দীঘির জল ।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে শিউলি ঝরে লাখে লাখে
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে প্রজাপতি কাঁপতে থাকে ।

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রঙ আলোক জ্বলে
লুব্ধ করে মুগ্ধ করে বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে :
আর হালকা বোঁটা ফুলের বুকে প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তার সীঁথায় রাঙা সিঁদূর দেখে রাঙা হল রঙন ফুল,
তার সিঁদূর টিপে খয়ের টিপে কুঁচের শাখে জাগলো ভুল !
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগ্‌ল মেঘে
কানে জোড়া দুল দেখে তার ঝুমকো-জবা দোলায় দুল্‌ :
তার সরু সীঁথার সিঁদূর মেখে রাঙা হল রঙন ফুল !

সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়, চাঁদমালা তায় ভাসতে থাকে !
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
কলমীলতা বাড়ায় বাহু বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে !
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে চাঁদের আলো ভাসতে থাকে !

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়, বিনি সূতার হার সে গড়ে,
দোলনচাঁপার ননীর গায়ে আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
কাঁনড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো চোখের পাতায় শিশির নড়ে
সে বেণীতে দেয় বকুলমালা বিনি সূতার হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশভরা দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদলে পরে মুক্তা ঝরে হাসলে পরে মাণিক হাসে !
কেরল কাঠের নৌকাখানি
জানে নাক' তুফান পানি,—

কুলকুলিয়ে ঢেউগুলি যায় নুইয়ে মাথা আশে পাশে ;
যদি সেঁউতি 'পরে চরণ পড়ে হয় সে সোনা অনায়াসে !

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায় দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি,
তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে !
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী পরাণ ঝোপে ভুবনজুড়ে !

মিলনোৎকণ্ঠা □ মোহিতলাল মজুমদার

বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার !
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
কাজললতাটি ধরে আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই—অলঙ্কার !
শুনেছি সে রূপ চমৎকার !

পরেছে বসন বুঝি লাল চেলী, ডালিম ফুলী ?
দুরু দুরু হিয়া—মণিহার তার উঠিছে দুলি।
এয়োরা যখন শংখ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখুভুখু চুল পড়িছে খুলি—
হিয়া দুরুদুরু উঠিছে দুলি।

কত দিবানিশি কাটানু স্বপনে—সেই সে মুখ
দেখিনি কখনো, তবু যে আমার ভরেছে বুক !

প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালী, বিকালে বকুল,
ফুটিয়াছে নীপ বরষা-আসারে ভরসা-সুখ,
সে সুখ আমার ভরেছে বুক।

এতদিনে বুঝি বিরহযামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশী বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর!
হাতে হাতে সেই বাঁধি মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি?
এসেছে কি আজি সে সুখ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর?

পাতি ফুলশেজ বসিব দু'জনে কথা না বলি,
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম কলি।
সে রূপ নেহারি আঁখি অনিমেষ—
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে রব কথা না বলি।

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন?—
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলী উজলি তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার!

সাঁওতাল যুবতী □ কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাষাণ কেটে গড়ন গড়ে প্রাণ দিয়েছে তাতে,
কালোয় আলোয় মিশেল করা ভ্রমর-গড়া হাতে।
নিখুঁত নিটোল মধুর গঠন জমাট আদরের,
শ্রেষ্ঠ ছবি স্বরগপুরের কষ্টি-পাথরের।
নয়ন না ও গভীর প্রেমের অথৈ সরোবর,
শ্যামল শীতল নলিন পাতে চখাচখীর ঘর।
রাঙা ধূলার ভাঙা পথে ছুটছে অবিরত
রক্ত-মেঘের বুকের কালো বিদ্যুতেরি মত।
লতায় বাঁধা অলক তাহার মন্দ বায়ে দোলে,
শশাঙ্ক নয় শশক-শিশু কিন্তু আছে কোলে।
জ্যোৎস্না এবং আঁধার ভেঙে গড়লে তারে বিধি,
পূর্ণিমা নয়, মূর্তিমতী কৃষ্ণা প্রতিপদই।
স্বাধীন সরল, কঠিন কোমল গিরির মধুকরী,
বিশ্বকবির কাব্য সজীব, 'বানে'র কাদম্বরী॥

কলেজের মেয়ে □ কালিদাস রায়

পাস করেছি, নিচ্ছি শিখে গোটা তিনেক ভাষা
কেশে বেশে সেজে করি কলেজ যাওয়া আসা
অভাব কিছু নেইক আমার রইনা অনাদরে
করতে যুগের যোগ্যা আমায় বাপ বহু ব্যয় করে
কিন্তু কোথায় সে,
সে ছাড়া মোর চপলজীবন সফল করে কে?

সভায় সভায় ডাক পড়ে মোর করতে রেসিটেশান,
গিটার বাজাই, ঘরটি সাজাই যেমন নয়া ফ্যাশান,
গান থেমে যায় বাবার ভারী গলার করুণ স্বরে,
মায়ের মলিন মুখ দেখে মোর প্রাণটা কেমন করে।
হায় রে কোথায় সে,
সে ছাড়া মোর তরুণজীবন সফল করবে কে ?

সজ্জা করে পরীক্ষা দিই লজ্জা তাতে পাই,
দেখতে এসে সবাই বলে ফরসা আরো চাই।
ভরসা মা দেয়, বিয়ে না হোক, চাকরী করে খাবি,
হায়রে পোড়া পেট ছাড়া আর নেই কিছুরি দাবি !
হায় রে কোথায় সে
সে ছাড়া এই তৃষিতপ্রাণ তৃপ্ত করে কে ?

জনারণ্যে কোথায় আছে বাঞ্ছিত সেই জন,
কতদিন আর রাখব বেঁধে লাঞ্ছিত যৌবন !
বাড়ী গাড়ী গয়না শাড়ী কিছুই তো না চাই,
একটি নিজের কুলায় পেলে ধন্য হয়ে যাই।
কোথায় সে না জানি,
সেই কুলায়ে ভুলাবে যে এই জীবনের গ্লানি।

আসবে কবে বঁধু আমার আর কতদিন দেরি,
আয়োজনের বিরতি নেই আমার জীবন ঘেরি।
স্বর্ণকারের আনাগোনা শুধুই বিড়ম্বনা।
বৃথাই আমার মনে মনে জল্পনা কল্পনা।
কোথায় আমার বঁধু,
এই জীবনের শ্রী সৌরভে কে যোগাবে মধু ?

কবি-রাণী □ নজরুল ইসলাম

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো—
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো
বিদায় বেলার সন্ধ্যাতারা
পূবের তরুণ রবি—
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি ?

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন,
তোমার প্রাণের হবি —
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি ! তোমার সবি।

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।

শ্যামলী □ জীবনানন্দ দাশ

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর সজ্জার কথা ভুলে
সকালে রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল :
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে ঃ
কাল কিছু হয়েছিল ;—হবে কি শাশ্বতকাল পরে

সংশয় □ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রূপসী বলে যায় না তারে ডাকা ;
কুরূপা তবু নয় সে, তাও জানি ;
কী মধু যেন আছে সে-মুখে মাখা ;
কী বরাভয়ে উদ্ধত সে-পাণি ॥

খেলে না ফণী দোদুল বেণীমূলে ;
চাঁচর চুলে ভ্রমর গুমরে না ;
অলকে তবু মলয় যবে বুলে,
বেড়েছে, ভাবি, বিধির কাছে দেনা ॥

ঝলে না কালো চপলা চল চোখে ;
অগাধে তার জ্বলে না ধ্রুবতারা ;

সে-দিঠি তবু রুচির কী আলোকে ;
কী বাণী রহে রহসে ভাষাহারা ॥

বাজে না বাঁশি বেহাগে তার স্বরে ,
গম্ভীরাতে মুরজ নাহি ফুটে ;
অসার কথা তথাপি সে-অধরে
বেদের চেয়ে গভীর হয়ে উঠে ॥

উদয়-রাঙা নির্ঝরিণী সনে
অতুলনীয় সে-ছল-ছাওয়া হাসি ;
বাসনা তবু, হঠাৎ আগমনে
চকিত খুশি সে-মুখে পরকাশি ॥

কান্না তার মুক্তামালা সম
গহন রঙে নহে তো ধুপছায়া ;
তথাপি চাহি উপেক্ষাতে মম
ভাস্থক লোরে বজ্রাহত কায়া ॥

বক্ষে তার যুগল হেমগিরি
নির্বাসিত করেনি মৃণালেরে ;
আঁচল তবু অনামা কলি পীড়ি
কি পরিমল সঙ্গে ফেরে ফেরে ।

অতন্থ তরে করেনি রচনা সে
ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কটিতটে,
সতত তবু ক্ষামার আশেপাশে
টংকারিত কুস্থমধন্থ রটে ॥

মেখলাঘেরা পৃথুল শ্রোণিভারে
মরালসম নহে সে মদালসা ;

তথাপি ঋজু দেহের আড়ে আড়ে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে কী লালসা ॥

কদমরেণু বিছানো সরণী তো
সুনাভি হতে ছুটেনি অভিযানে
কদলী-উরু-তোরণ-সুশোভিত
লব্ধকাম অমরাবতী পানে ;

বিজয়ী মন তথাপি সেথা থামি
মোক্ষ মাগে পরম পরাজয়ে।
ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি ?
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে ?

তপোদৃশ্য □ অমিয় চক্রবর্তী

তিন নান্
          ঐ চলে
                    শুধু কালো শাদা

দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত
                    গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত গাছ সারি

উপাসিকা
উপাসিকা

তিন নান্ ঐ চলে শুধু কালো শাদা
তিন নান্ কনভেণ্ট ঐ গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত শুধু গাছ সারি
তিন নান্ চলে যায় বেশ কালো সাদা।

কুড়ানি □ মনীশ ঘটক

১

স্ফীত নাসারন্ধ্র, ছ্ু'টি ঠোঁট ফোলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া,
'খট্টাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া।'

এর চেয়ে মর্মান্তিক গুরুদণ্ডভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যানধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, ছ্'চোখ ডাগর
এলোকেশ মুঠে ধরি, দিলাম থাপড়।
রহিল উদ্গত অশ্রু স্থির অচঞ্চল,
পড়িল না এক ফোঁটা। বাজাইয়া মল
যায় চলি ; স্বগত, সক্ষোভে কহিলাম
'যা গিয়া! একাই খামু জাম, সত্রি আম।'

গলিতাশ্রু হাস্যমুখী কহে হাত ধরি,
'তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী।'

২

পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
অনভ্যাস্ত সমুদ্ধত লাবণি প্রকাশে
বিপর্যস্তদেহা তন্বী ; অধরোষ্ঠ পাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবীর
সুদূর করেছে তারে—করেছে নিবিড়।
সান্নিধ্য সুদুর্লভ, তবুও সদাই
এ-ছুতা ও-ছুতা করি বিক্ষোভ মেটাই।
গাছের ডালেতে মাখি কাঁঠালের আঠা
কখনো সখনো ধরি শালিক টিয়াটা।

কুড়ানিকে দিতে গেলে করে প্রত্যাখ্যান,
'আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান'

অভিমানে ভরে বুক। পারি না কসাতে
সেদিনের মত চড়, অথবা শাসাতে॥

৩

ছুটিতে ফিরিলে দেশে কুড়ানি-জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া কন—'শোন্ মণি,
কুরানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত?
হইয়া উঠতেয়াছে মাইয়া পাহার পর্বত।'
'সুপাত্র দেহুম'—কহি দিলাম আশ্বাস
চোরাচোখে মিলিল না দরশ আভাস।
ম্লানমুখ, নতশির, ফিরি ভাঙা বুকে,
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে—'মা তোমার বুদ্ধি ত জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিসরায় বর?'

সহসা থামিয়া গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন!
সহসা দক্ষিণা বায়ু শাখা দুলাইয়া
সব কটি চাঁপাফুল দিল ফুটাইয়া॥

শকুন্তলা □ প্রমথনাথ বিশী

হে সুন্দরী শকুন্তলা, বহুবর্ষ পরে
তোমারে স্মরিছে আজ বিদেশের কবি,
তুমি ঠাঁই লভিয়াছ অনন্তের ঘরে,
তাই চির উদ্ভাসিত তব নিত্য ছবি।

বনজ্যোৎস্না লতাকুঞ্জে তব গাত্রলীন
খিন্ন শতদলগুলি গেল যা ঝরিয়া,
তারি গোটা দুই লাগি চিররাত্রি দিন
উদ্‌ভ্রান্ত অধীর চিত্ত মরিছে কাঁদিয়া
অধিক করি না আশা তোমার নিকটে,
জীবনের জীর্ণজ্বরে না পারি ঘুমাতে,
মোরে শান্ত করি দাও—চাহি বারে বারে—
তোমার অমর-করা একটি চুমাতে
দুষ্মন্ত পাবে না টের, নাহি কালিদাস—
এ গুপ্ত রহস্য আর কে করিবে ফাঁস ?

মৌটুসি □ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'এই মাত্র এক বন্ধুর প্রেমপত্র পেলাম
তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি—'
লিখছ আমাকে ঃ
'আর সেই ছাইয়ের সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে
টিপ করে পরেছি কেমন কপালে
তুমি আমার সেই সচন্দ্র মুখখানি দেখবে না ?
তোমার চিঠি আগে গয়নার বাক্সে রাখতাম
এখন রাখছি সিঁদুরের কৌটোয়'
সিঁদুর কখনো আমার সিঁথিতে আঁকি না
কপালে টিপ করে পরি
যখন আমার নাতি-নাতনি হবে
আর আমার সিঁদুরের কৌটোয় দেখবে তোমার চিঠি,
তখন তারা কি আশ্চর্য হবে বলো তো, কী আনন্দিত,
জিজ্ঞেস করবে, তোমার কে হত ?

কী জমিয়ে গল্প বলতাম রূপকথার
একটু বিপদে পড়তাম না।

প্রাণের পড়শি,
হলদে সুতোর রাখী পরিয়ে দাও আমার হাতে,
আমাকে তোমার অন্যতমা না রেখে
একতমা করে নাও।
এখানে নতুন বৃষ্টি নেমেছে
প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পাঠাই তোমাকে।
গতবার যখন বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল
তখন তোমাকেই পাঠিয়েছিলাম আমার আনন্দের আবীর।
তুমি আমাকে কী দেবে ?
তোমার কাব্যের মধ্যে সন্ধান পাচ্ছি
এক দুরন্ত দুঃশাসনের মন,
অথচ কী গভীর শান্তি দিয়ে ভরা !
চোখ বুজলেই সাড়া পাই তোমার প্রগাঢ় অস্তিত্বের।

কত ঐশ্বর্য নিয়েই না এসেছ আমার একাকীত্বকে সাজাতে,
এই বুঝি আমার ঘুমন্ত আগুন জ্বালিয়ে দিলে,
না, জাগিয়ে দিলে আমার ঘুমন্ত কবিতা।
আমি যাই কেন না বলি, তুমি পাঠাও কেবল
সেই ভালোবাসা
ভোরবেলাকার মায়ের মুখের মতো অপরূপ।
বন্ধু, পদ্মার জলে অঞ্জলি দিলে তা কি পৌঁছোয় গঙ্গায় ?'

আমি লিখেছিলুম : 'মৌটুসি, সব অঞ্জলিই সাগরে যায়,
তুমি-আমি, পদ্মা-মেঘনা গঙ্গা-গোমতী কর্ণফুলী-শীতললক্ষ্যা
সব এসে মেশে এক সাগরে।'

মুখরা □ অপরাজিতা দেবী

বেশ করেছি, খুব—তোমার তাতে কি ?
দেখতে তোমায় দেবোই নাকো আমার হাতে কি !
মুঠোর ভিতর যাই থাক তা জানতে দেবো না !
ধমকে আমায় চমকে দেবে একটু ভেবো না
বেশ করবো ড্রয়ার খুলে কোরবো চুরি সব !
পেন পেনসিল ডায়ারি এই ভা-রি তো বৈভব।
বেশ করেছি,—করছি চুরি,—পুলিস ডাকো গে !
শাস্তি দেবার প্রেসক্রুপ্‌সন্‌ কোরতে থাকো গে !
ঘাঁটবো আমি যখন তখন তোমার খাতা বই !
দাও না কোরে ডাইভোর্স কেস কিংবা তালাক-সই !
·········আলবৎ ! ফের বলবো আবার বর নয় বর্বর !
যখন তখন জবর জবাব করবো মুখের পর !
ইঃ হি ! ভারি তো ! পরম গুরু ! উকারটা দাও বাদ।
গরুই বটে ! নৈলে কি হয় গুরুর পদের সাধ ?
·········কোরবে বিয়ে আবার ? উর্‌র্‌র্‌ ! কোরতে পারো কই ?
তোমার কাছে মানবো যে হার এমন মেয়েই নই,
—এভার রেডি, সতীন নিতে ! আজই আনো,—যাও !
বরণ করে তুলতে বলো,—বহুৎ রাজী তাও।

তোমায় নিয়ে ঝগড়া করি একলা এখন রোজ !
দোসর পেলে বাড়বে যে জোর, তার কি রাখো খোঁজ ?
দুই সতীনে দু'পাশ থেকে বাকি-বুলেট-শেল
হানবো যখন ঐ বুকেতে, হার্টটি হবেই ফেল !
একটি মুখের মেশিন-গানে ডাকছো ত্রাহি ডাক্‌
ডবল হলে তখন হুঁহুঁ—কাজ নেই আর থাক !

হার মানছো ?·········আচ্ছা তবে নাক মলে চাও মাপ !
কবুল করো,—আর কখনো কোরবে না এই পাপ !

কোরবো চুরি যা খুসি তাই, বলবে না আর কিছু !
দেখবো তোমার ড্রয়ার খুলে, লাগবে না আর পিছু

উঁ-হু মুঠোয় কি রেখেছি, দেখতে দেবো না !
আদর করে ভুলিয়ে দেবে মোটেই ভেবো না ।
কী নিয়েছি ! হাতড়ে দেখ মেজ়ায়ের ঐ জেব !
—পালাই এবার,—সেলাম তবে,—পরম গুরুদেব !

সাঁওতাল মেয়ে □ কানাই সামন্ত

নিকষ পাষাণে গড়া প্রতিমা ও মেয়ে
সাঁওতাল মেয়ে,
চলেছে গেরুয়া-রঙ রাজপথ বেয়ে
কোন্ রুক্ষ উদাস ডাঙায়
দু'একটি আম জাম পাকুড়ের ছায়
সুখশান্ত গ্রামে কোন মাটির কুটিরে—
মনে তাই তোলাপাড়া করি ফিরে ফিরে ।

ছাপায়ে উঠিতে চায় লাবণ্য কি শ্যাম দেহসীমা !
চলনভঙ্গিমা
রাজকন্যা রাজেন্দ্রাণী হেন
রূপকথা কল্পলোকে বাস যার জেনো
মনের গোপনে,
কোনো রাজা রাজড়ার প্রাসাদভবনে
হয়তো যে নাই ।

বিস্ময়ে দু'চোখ ভরে চাই ।
ঋজুগ্রীবা
লগ্ন হয়ে শোভা পায় কিবা

দু'গাছি পুঁতির হার, পীত, শুভ্র, সিঁদূর বরণ ;
যেমনি ওঠে বা পড়ে সলীল চরণ
ওঠে দুলে দুলে
কুণ্ডলিত ঘন কালো চুলে
ফুল্ল সোনালের ফুলে খণ্ড খণ্ড রোদ।
আচমকা মোর
হৃদয়ের চারিধার করেছে আমোদ
চলার বাতাস লেগে ওর।

ভাবি তাই,
চৈত্র পূর্ণিমার রাতে বন্ধু আসে নাই
কুটির দুয়ারে ওর ?
অতনু দেবতা হেসে প্রণয়ের ডোর
রোমাঞ্চিত দু'টি প্রাণে বাঁধে নি কি তবে
বীজ বুনিবার ক্ষণে, পৌষালী পরবে,
ওপার-পল্লীর কোনো বাঁশরির রবে ?
বাঁধে নি কি তবে ?

গোধূলির লগ্নে কবে এসেছিল বর
দরিদ্র বাপের ঘর
আনন্দে উৎসবে ভরি দিয়া ?
শাল মহুলের শাখা সাক্ষী করি সলজ্জিত হিয়া
ঘামে ভেজা হাতখানি রেখেছিল হাতে ?
আলোকিত মুখরিত উৎসবের রাতে
জননীর হাতে বোনা শোভন বসনে
সেজেছিল—কিশোরীর প্রাণের গোপনে
অচেনা সুরভিশ্বাস শাল মহুলের গন্ধ সাথে
ঝরেছিল উৎসবের রাতে ?

বৎসরান্তে রথের মেলায়
সাশ্রু-মেঘে-ছায়া-করা বিকাল বেলায়
মদমত্ত পুরুষের দল
বাজায় মাদল
যবে আবেগে উল্লাসে,
তরুণীরা নাচে আর দিবাস্বপ্ন ঘোরে মৃদু হাসে
লোল কটি পরস্পর বাঁধি বাহুপাশে ঃ
সব মিলে যেন কোন্ সুদূর সাগরে
একটি কাজল ঢেউ ওঠে আর পড়ে
সুখালস সুললিত তানে।
সে তরঙ্গ মাঝখানে
দুলেছিল নাচে ?

শ্রাবণের মেঘমালা যবে ঘেরিয়াছে
নীল মোহে নীল গিরিশির
গৃহকাজে ফেরে তবু চিত্তে তরুণীর
গুঞ্জরি ফেরে কি হায় অবোধ আবেগ ঃ
পূবে গুরু গরজায় মেঘ,
অজয় নদীতে বান পড়ে,
দু' নয়নে জল ঝরে
আজ মনে মনে !*

সজল জলদকান্তি ! শরতের শুভ্র মেঘ-সনে
উপমা জাগায় অতি
লঘু তার গতি !
কখন সে গতিবেগে রাজপথ বেয়ে
ভেসে চলে গেল এক সাঁওতাল মেয়ে ॥

* সাঁওতালি গানে আছে— পূবের দিকে মেঘ ডাকে,
নদীতে বান পড়ে,
চোখেরই জল ঝরে মনে মনে ॥

একটি মেয়ে □ অজিত দত্ত

আমাকে একটি মেয়ের খবর দিতে পারো ?
বলো তো একটি ছোট মিষ্টি মেয়ের কথা,
যে মেয়ের নেইকো রূপের একটু অহংকারো,
মনে যার নেই কোনোরূপ গভীর ক্ষতের ব্যথা,
হাসি যার ঠোঁটের কোনায়, চোখের কালোয় আঁকা,
খুশি যার দেহের লীলায় ফুলের মতো ঝরে,
যে মেয়ে ঝর্ণা যেন, যায় না ধরে রাখা—
এনো তো সেই মেয়েটির খবর দয়া করে।

এলা-দি □ বুদ্ধদেব বসু

পুরোনো পাড়া, ট্রাম থেকে দূরে ; ব্যস্ততা, ভিড়, খাটুনির বাইরে ;
বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় গম্ভীর— আমি সেখানে সময় পেলেই যাই,
এলা-দিকে দেখতে।

'দেখতে' কথাটাই ঠিক কেন না আমি, ছেলেমানুষ,
সবেমাত্র উনিশ আমার বয়স, কোন্ কথা আমি বলতে পারি এলা-দিকে,
যা এর আগে অন্য অনেকে গুনগুন করেনি তাঁর কানে —
সেই সব ভাগ্যবানের দল, কয়েক বছর আগে জন্মাবার সুযোগ পেয়ে
আমার জন্যে কিছুই আর বাকি রাখেনি যারা !

মস্ত ঘর, ঘর পেরিয়ে বারান্দা। বাইরে চৈত্রমাসের দুপুর,
তেতে উঠছে রোদ্দুর, ধুলোর ঘূর্ণি শিরশির করে বয়ে যায়।
কিন্তু এখানে ঠাণ্ডা, ঝাপসা আলোয় চোখের সুখ ছড়ানো,
শব্দ নেই। সবুজ চিকে আব্রু-ঘেরা এই বারান্দা,

ফাঁকে ফাঁকে রোদের ফিতে কেঁপে ওঠে, আর তাতে
গলে গলে মিশে যায় পর্দার রং, দেয়ালের রং,
দেয়ালে ঝোলানো ছবির আভা উজ্জ্বল, কোণে দাঁড়ানো
শৌখিন গাছের হালকা-সবুজ। সবুজ আভা, হলদে আর সবুজ
আর বেগনি আভা ; জলে ডুব দিলে যেমন দেখায়, তেমনি ;
যেন বাতাস জুড়ে গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর—তেমনি ঠাণ্ডা,
আর উষ্ণ, আর সম্ভোগের আভাসে ভরপুর।

কুশান-আঁটা শিঙাপুরি বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসেন
এলা-দি, শান্তিনিকেতনি চামড়া-বাঁধানো মোড়ায় পা রেখে।
পাৎলা তাঁর পা দুটি, তাঁর মুখের চেয়েও ফর্শা,
নীলচে সরু শিরায় আরো সুন্দর : তাঁকে দেখার আগে
আমি কখনো ভাবিনি মানুষের পায়েরও এত রূপ হতে পারে।
আমি তাকিয়ে থাকি সেই পায়ের দিকে, যেখানে লুটিয়ে পড়ে
তাঁর শাড়ির পাড় ময়ূরের বুকের মতো নীল ;
তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সিগারেট ধরান।
যখন তাঁর মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোয়, আমি বুক ভরে
নিশ্বাস টানি, নিশ্বাসে তাঁর বিলেতি সিগারেটের সুবাস পাই,
আর সেই সঙ্গে, ইঞ্জেকশনের ছুঁচের মতো, আমাকে বেঁধে
জানি না কোন্ অদ্ভুত নামের সুগন্ধ। আমার মাথার মধ্যে
ঝিমঝিম করে ওঠে—নিজেকে এত হালকা মনে হয়
যেন আমি পাখির মতো উড়ে যেতে পারি।

গাছ থেকে শুকনো পাতার মতো, তাঁর ঠোঁট থেকে একটি-দুটি
কথা যখন খসে পড়ে, শুধু তখন আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই।
চোখে চোখ পড়লে একটু হাসেন এলা-দি ; লিপস্টিকে রাঙানো
ঠোঁটের ফাঁকে তাঁর দাঁতের সারি এত উজ্জ্বল যে আমি তখনই
মাথা নিচু করি—পাছে ভব্যতার সীমা পেরিয়ে যায়।
তাছাড়া আমার অন্য কথাও মনে পড়ে।

মনে পড়ে আমার কাকিমাকে—এঁদো গলির একতলায়
যাঁর বাসা, যাঁর দিনের মধ্যে ছয় ঘণ্টা কাটে রান্নাঘরে,
যাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছোটো-হয়ে-যাওয়া জামা প'রে
ঘুরে বেড়ায়, যিনি দিনে-দিনে ফ্যাকাশে আর রোগা
হয়ে যাচ্ছেন, অথচ এখনো ডাক্তার ডাকা হচ্ছে না
পাছে কোনো শক্ত অসুখ ধরা পড়ে। অথচ তাঁরও
ছিলো রূপ—সেই ভগবানের দান, মানুষের যত্ন ছাড়া
যা বেশিদিন বাঁচে না।

মনে পড়ে আমাদের ঠিকে-ঝি হরিমতিকে—সকাল থেকে সন্ধ্যা
যে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, যার মুখের মধ্যে
দুটো মাত্র দাঁত আছে এখন, আর সে-দুটো ঝুলে-পড়া প্রকাণ্ড
আর নোংরা হলুদ। তাকে দেখে এখন আর স্ত্রীলোক
বলে মনে হয় না, তার শরীর যেন এক ফালি তক্তা ;
আর তার মুখ যেন মেয়েরও নয়, পুরুষেরও নয়।
খুব কম কথা বলে সে, শুধু পিঠ বাঁকিয়ে কাজ করে যায় ;
শুধু কাজ, শুধু বেঁচে থাকা, যে কোনো রকমে
নিছক বেঁচে থাকা শুধু—এ ছাড়া তার অন্য কিছুরই
সময় নেই। তার দিকে তাকাতে আমার লজ্জা করে।

আর এলা-দি যখন বিছানা ছাড়েন, তখন তাঁর স্বামীর
আপিশের গাড়ি তৈরী ; উঠে কফি খান, স্নানে ও প্রসাধনে
বাজে এগারোটা, তারপর হয় গাড়ি নিয়ে সওদায় বেরোন,
নয় গালগল্প করেন টেলিফোনে, আর নয়তো
এই বারান্দায় বসে ছবিওলা বিদেশী পত্রিকার পাতা ওল্টান।
বাড়ি সাজানো, শরীর সাজানো, বিকেলের দিকে ঘণ্টা খানেক ঘুম,
সপ্তাহে পাঁচটা-ছ'টা পার্টি, নানা দেশের ধনী মানী বন্ধু,
মাঝে গ্যাংটকে বা কলম্বোতে বা বার্সেলোনায়

বেড়াতে যাওয়া। সব শ্রম, সব কষ্ট, সব দম-আটকানো
অন্ধকূপের উত্তরে এলা-দির আলস্য একটি সুন্দর
গাছের মতো ছড়িয়ে আছে, পাতায় পাতায় অজস্র আর সবুজ,
রঙিন ফুল অনবরত ফুটে উঠছে, কিন্তু কখনো ফল ধরে না।

তবু বলি: এলা-দি, তুমি এমনি থেকো চিরকাল;
কখনো কোনো সমিতির নামে সমাজ সেবা কোরো না,
চাঁদা দিয়ো না উদ্ধারকারীদের, হঠাৎ কোনো বিবেকপীড়ায়
রুক্ষ হয়ে যেয়ো না। এমনি থেকো—এমনি সুখী ও বিশ্রান্ত,
সুন্দর ও সুগন্ধি, আর এমনি নিষ্প্রয়োজন।

কিশোরী □ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো কিশোরী, সাদা শাড়ি, কায়দা কি?
রূপের ফাঁকির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
চোখে উথলানো দাবি চাঁদ আর ফসলের,
চাঁদোয়ার নিচে জড়ো তার কালো চামড়ার নিন্দুক,
ফর্সা গিন্নী, ফর্সা মেয়ে বৌ
চিকন গয়না, রঙিন বস্ত্র।
হিংসায় মরে যায়, হায় রে!

চেয়ে দ্যাখো মেয়েটার কাণ্ড!
কালো মেয়ে তুই চোখে তোর কাজলের ক্রিয়া নেই,
চুলে নেই নিবিড় বিন্যাস,
ঠোঁটে নেই আবছা রাঙা রং-ছড়িটার স্পর্শ,
ব্লাউজ যেন তোর বুকের মহিমা জানে না,
ভাঁজ যেন দেহে তোর কোথাও নেইকো!

কালো মেয়ে তুই,
বেশ ভূষা রকমে-সকমে
যেন তুই মেয়ে নোস !
যেন তুই ঘরছাড়া বিপ্লবী,
যেন তুই বিদ্রোহী ।—
কে জানে কম্যানিস্ট কি না তুই

মন-দেওয়া-নেওয়া □ বিষ্ণু দে

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,   প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দু'মাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না ।
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের ?
দু'মাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,
রহস্য-ভরা অস্ফুট ভাষা লাগতো ভালো !
তখনকার সেই অবস্থা নাকি প্রেমের বাসা ?

আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি ।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাইতো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে ;
এরি নাম 'প্রেম' ।
কিন্তু মানুষ কেমন করে যে এই তে বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয় !

আশ্চর্য না ?
এই ধরো—আমি, নবনীকান্ত—

দিব্যি মহৎহৃদয়, দিব্যি ভালোই ছেলে—
অনেক মেয়েই চায় তো আমায় তাদের স্বামী !
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—
ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়ে

কাব্যির ঘোরে কত উচ্ছ্বাস ঐ বেচারার গলায় গালে—
তু'হাতে বাহুতে বুকে আর ঠোঁটে তার দিয়েছি !
ডলু যদি সেটা—চিত্রগুপ্ত যেমন করে—
সব কর্মের হিসেব-নিকেশ চুলচেরা ভাবে খাতায় ধরে ;
ডলু যদি এই প্রেমের বিষয়ে সে-রকম ভাব মাথায় ভরে ?
বিহিত কি তার ? কীই যে করি !
অমল মোহিত ইত্যাদিকে তো এগিয়ে দিলুম—
"ডলু যে তোমার খোঁজ করে ওহে !"
কতটা আশাই না করেছিলুম !
হল না কিছুই !
আই-সি-এস'ও অকাতরে ডলু ফেলেই দিল !
(মেয়েরা কি বোকা !)

আর সেই দিনই তুপুর বেলায়
বাস-এ করে ডলু এই এইখানে
আমার এ-ঘরে ছুটে এসেছিল !
সে কথা যাক, তা কথাটা হচ্ছে—কেমন করে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায় ?
তা অবশ্য কোনো গোল না করে—
তা না তো আবার স্ক্যাণ্ডালে তুই কান বেচারিরা যাবে যে ভরে ।

মহা মুশকিল !
ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে !

আমি যদি খুব সাবধানে কোনো অভ্যাস তুলি—
ডলুর দোষ যে আমার কেমন বিশ্রী লাগে !
আশা করি ডলু চটবে, কিন্তু সে চটে নাকো !
হয়তো বা বলে "ও দোষ যে আছে, আমি তা মানি,
সেই বলে চুমো খাবে না আমাকে ?
—তোমার ও-মুখ এখানে রাখো।"

কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,
(আগেই বলেছি, অজানাই হল প্রেমের নানা,
শারীর মানস, ভাবের বাণী)
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে ডলুই নিজে।
এমন কি সেই আঁচিলটা—তাও ! সেটাও জানি !
নতুন তো নেই কিছুই ! এখন করবো কি যে ! করবো কি যে ?
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে !
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর পাব না কি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে ?
ক্লান্ত লাগে ॥

একটি মেয়ে □ সমর সেন

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হল :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম ;
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

স্বর্ণিল □ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণাকে একদিন ঝর্ণার পাশে
বললাম—বল দেখি কে কোথায় হাসে ?
সে বলল—ঝর্ণার জলের আওয়াজ
নিয়ে বুঝি বাড়াবাড়ি করাই রেওয়াজ ?
তখন পাহাড়ে ছায়া, বিকালের আলো·········
সে হঠাৎ বলে ওঠে—এই বেশ ভালো।
চুপ করে আছ কেন কইছ না কথা ?
বলি—'বুঝবে না তুমি কোনখানে ব্যথা।'

ফের একদিন সেই ঝর্ণার পাশে
বললাম—শোনো দেখি কে কোথায় হাসে ?
বলল সে—বুঝেছি গো ; আমাদেরই মন !
—আমাদেরই মন ?
সুখে হেসে উঠলাম আমরা দু'জন।

আরো একদিন বলি—চেয়ে ত্যাখো স্বর্ণা
পাহাড়ের বুকে ঐ ঝাঁপ দেয় ঝর্ণা !
পাহাড়ে তখন ছায়া, বিকালের স্বর্ণিল আলো—
একটুও শীত নেই ; ওর গায়ে শাড়ি ঝলসালো !
বলল—ক্লান্ত যে লাগে আজ বড়ো
বললাম—ঝর্ণার মতো ভেঙে পড়ো ;
প্রেমের পাহাড় নিয়ে আমি আছি পাশে।

তা শুনে সে হাসে,
কৌতুক মেশা মিছে শাসনের ছলে
সে আমাকে বলে—ঝর্ণার মতো যদি উচ্ছলা হই
পারবে কি হতে তুমি কঠিন পাষাণ
নামের অনুপ্রাস কর না যতই ?

ওদিকে যে অবেলার আলোর ভাসান
পশ্চিম পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয়
সোনালি রোদের রাঙা নিশেন উড়োয়।

ছায়া নেমে আসে খদে, অতল অথৈ !
ভাঙা-চোরা ছায়া সব, জমা হয় পাহাড়ের ঢলে
'নন্দাদেবী'র চুড়ো বহুদূরে সোনা হয়ে জ্বলে·········
গুঁড়ো হয় নিমেষ কতই।

স্বর্ণা হেলান দেয় পাহাড়ের গায়
শিথিল সে বাহু দুটি তুষারের নদী
ঘুম যেন দেহে তার ছায়া ফেলে যায়
সে-ছায়ায় একটুও বসা যায় যদি
কী-কোরাসে ধমনীরা গেয়ে ওঠে গান
চলে যায় অবেলার আলোর ভাসান
নগ্নিকা 'ক্যাম্পটির' তাথৈ, তাথৈ—
আচমকা জীবনের মুখোমুখি হই।

ঝর্ণার সাথে মিলে যায় যার নাম
ঝর্ণারই মতো ভঙ্গিম যার ঠাম
সে মেয়ে তো ঝর্ণাই, আমি গিরি নই—
যদিও মনের খদ অতল, অথৈ !

সুদেষ্ণার জন্মদিন □ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১

একমাত্র পার্টি শেষ হল। প্রত্যাবর্তনের মুখে
সুসজ্জিত সকলেই একবার ঠোঁটে হাসি এনে
বলল : 'তাহলে। ভারী ভালো লাগলো এবার এই
জন্মোৎসব।' কেউ কেউ আড়চোখে ঈষৎ কৌতুকে
দেখল সুদেষ্ণা তার পুষ্ট দেহটাকে

কী করে অমন মুগ্ধ ভঙ্গিমায় সাজিয়েছে
এবং কী করে তার প্রৌঢ় স্বামী হরিবিষ্ণু রায়
সামাজিক ভব্যতার বিজ্ঞাপিত ম্লান অভিনয়ে
অভ্যস্ত নটের মতো অকৃত্রিম দাক্ষিণ্য ছড়ায়।

২

কেউই এখন নেই। ঘর স্তব্ধ, শান্ত অন্ধকারে
প্রাণ তার নিমজ্জিত আলোগুলো নিভলো যখন
এবং কাজের শেষে ঝি-চাকরেরা ফিরে গেল
যে যার নির্দ্দিষ্ট ঘরে। অন্ধকারে অলিন্দের ধারে
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো সুদেষ্ণা কখন
দাঁড়িয়েছে। হরিবিষ্ণু অন্যদিকে ঘরের শয্যায়
ফিরে গেছে; প্রৌঢ় বয়সের ঘুম চোখের পাতায়।

৩

সুদেষ্ণা এখনো তার জন্মদিন প্রতিপালনের
দুর্ভেদ্য নিগড়ে বন্দী; হরিবিষ্ণু নিজেই উদ্যোগী
এবং যুবতী পত্নী সুন্দরী ও সুশোভিত হলে
কোন্ না প্রৌঢ়ের মনে জাগে শান্ত বিদ্যুৎবিলাস।
সুদেষ্ণা সাতাশ আর হরিবিষ্ণু সম্প্রতি পঞ্চাশ
তবু যেন জন্মদিন দাম্পত্যের মার্জিত আশ্বাস।

৪

সুদেষ্ণা দাঁড়'লো এসে অন্ধকার বারান্দায়
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো। জন্মদিন তার
নির্জনে জাগিয়ে তোলে অন্য স্মৃতি। দেখা যায়
অদূরে বাগানে নীচে গাছে-গাছে ফুল
ফুটে আছে; হঠাৎ হাওয়ার তীব্রতায়
মুঠি মুঠি গন্ধ ছাড়ে গোলাপ কি মালতী বকুল।
সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে থাকে, তার মনে প্রাণে

তখন স্মৃতির ঢেউ, প্রেমাংশুর সেই শান্ত মুখ
মনে পড়ে—যে প্রেমাংশু তাকে বহুবার
বলেছিল ঃ 'তুমি ছাড়া আর কেউ জীবনে আমার
সত্য নয়, তুমিই আমার শতবার !'

৫

সুদেষ্ণা এখনো ভাবে ঃ প্রেমাংশুর এই হিংস্রতার
কী দরকার ছিল ? কুমারীর যুবতী শরীরে
যা কিছু গোপনলভ্য এবং শিল্পিত
অনবদ্য সুষমায়, তার সাড়া পেয়েও কখন
প্রেমাংশু এলিয়ে গেল, পারলো না আর
প্রেমিকের মতো দীপ্ত, মহীয়ান হতে।
ভেসে গেলো প্রলোভনে সময়ের স্রোতে
উচ্চ খেতাবের মোহে ধনী শ্বশুরের পাত্র হতে।

৬

সুদেষ্ণার জন্মদিন ভাষান্তরে স্মৃতিতর্পণের সেই দিন
যেদিন ঘৃণায় তার শুদ্ধ হয় প্রেমিকের ঋণ।

বেশ্যা □ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবে খুনী বলেছিল বেশ্যার রোদন শুনে
'তুই পাপী যদি,
তোর পায়ে মাথা রাখলে সেরে যাবে আমার অসুখ !'

আজ বার্ধক্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমারো
আরোগ্যের জন্য এই আর্তনাদ। আমি আদর্শের অন্ধকারে
নিজের জননী জায়া পুত্রকন্যাদের তিলে তিলে
অনাহারে রেখে খুন ক'রে

এখনো বেশ্যার পায়ে মাথা রাখলে মানবজীবন
লাভ করতে পারি।

যে বেশ্যা ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দিতে
নিজের কান্নার স্রোতে রোজ দেয় সতীত্ব ভাসিয়ে।

আমার স্ত্রী □ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তোমাকে দেখেছি কবে মহীয়সী ঐশ্বর্যে গৌরবে—
স্বাচ্ছন্দ্য বা খুসি ঘেরা অনিরুদ্ধ উদ্দাম উল্লাসে,
চুলের পতাকা মেলে দিব্য কান্তি একান্ত উজ্জ্বল,
বর্ষার ঘাসের মতো টকটকে সতেজ সবুজ,
কিম্বা এই শরতের গাঢ়নীল আকাশের মতো,
অথবা বসন্তবনে জীবনের সোচ্চার প্রকাশে?
দু'হাতে রুখেছো দস্যু-সংসারের দারিদ্র্য-দানব
কতদিন অনশনে হাসিমুখে বাসাংসি জীর্ণানি
দিয়ে সুচিস্মিত বরতনু রেখেছো মহান করে।
দিবসে সংগ্রাম সুরু ঃ ন'টাতে স্বামীর ভাত আর
ছেলেমেয়ে স্কুলে গেলে দুপুরে সেলাই, রুগ্ন অন্ধ
শ্বশুরের সেবা, বাসনের কাঁড়ি মাজা, ক্ষার কাচা ঃ
সন্ধ্যায় হিসাব মতো বাঁধা কাজ, স্বামীপুত্র ঘর।
তারপর রাত এলে—স্নিগ্ধ স্বর—'কিগো ঘুম এলো'?

সুনন্দার দুঃখ □ বটকৃষ্ণ দাস

সুনন্দা, তোমার দুঃখ জানি আমি। কিন্তু নিরুপায়।
আমার আয়ত্তে নেই কাঞ্চন কৌলীন্য ঘরবাড়ি
অর্থাৎ তুমি যা চাও। আমি শিল্পী। একান্ত আনাড়ী
জীবনের কূটকর্মে। সমন্বয়ী রঙে ও রেখায়

ছিন্নভিন্ন স্মৃতির টুকরোকে আমি রূপ দিই : গড়ি
জীবনের যন্ত্রণার রক্তক্ষরা নিঃসঙ্গ প্রতিমা
অন্ধকারে। যতো বাঁচি, এই আর্ত অস্তিত্বের সীমা
আমাকে অস্থির করে। নিদ্রা কাড়ে নিষ্ঠুর শর্বরী।

সুনন্দা, তুমিও জানো, জীবনলক্ষ্মীর বরাভয়
চাইলেও মেলে না। তাই অদৃষ্টের দেবতাকে রোজ
খাজনা দিয়ে, নির্বিকারে আমি তার অতীব সহজ
নিয়মকে মেনে চলি। শিল্পী আমি। আমার বাঙ্ময়
হৃদয়কে রূপ দিই। আযৌবন যে নারী আমাকে
ভালোবেসে পুড়ে গেলো, আমি তার শীতল অঙ্গারে
নিজেরই ব্যর্থতা ঢাকি। যে-আধারে তুলে ধরি তারে-
তোমার অজ্ঞাত নয়, সুনন্দা, তুমিও চেনো তাকে।

কতিপয় আমলার স্ত্রী □ আবদুল গণি হাজারী

আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী তোমার দিকে মুখ ফেরালাম
হে প্রভু আমাদের ত্রাণ করো বিশ্রামে বিধ্বস্ত আমরা
কতিপয় আমলার স্ত্রী
হে প্রভু আমাদের স্বামীরা অগাধ নথিপত্রে ডুবুরি
(কি তোলে তা তারাই জানে)
পরিবার পরিকল্পনায় আমরা নিঃস্ব সময় আমাদের পিষ্ট করে যায়

আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা
কোন মহৎ চিন্তার কিনারে এবং ফ্যাসান পত্রিকার বিবর্ণ পাতা
দৈনিক কাগজে সিনেমার ইস্তেহার আর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উলঙ্গ
ছবি এবং একটি প্রাপ্ত-প্রয়া মহত্ত্বের শিহরণ

কোমরের উপত্যকায় মেদের আক্রমণ উদরের স্ফীতি
চিবুকের দ্বিত্ব স্তনের অস্বাস্থ্যে শঙ্কিত
হে প্রভু আমরা চর্বির মসোলিয়মে হাঁসফাঁস
আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী
ভাঁড়ার আমাদের লক্ষ্মী বালিশের ভাঁজে উদ্বৃত্ত হাতখরচ
আয়নার দেরাজে হেলেন কার্টিস এনি ফ্রেঞ্চ-মিল্ক
এস্ট্রিনজেন্ট ডিওডরেন্ট হ্যাণ্ডলোশন রেভ্‌লন
ক্রিশ্চিয়ান ডিয়োর এবং রুবিনষ্টিন
অবশ্য স্বামীদের কাছ থেকেই উষ্ণ প্রেমের ঘাটতির
প্রৌঢ় ক্ষতিপূরণ

আর্দালীর কুর্নিশে গর্বিত স্বামীরা অফিসে সর্বক্ষণ
অন্যের পদোন্নতির বাধা দরখাস্ত নাকচ
এবং কতিপয় পদস্থ দস্তখত
বাড়ী ফিরেও হায় বন্ধুর প্রমোশনে ঈর্ষিত
বেনামী ব্যবসার লাভক্ষতি
তারপর টেলিফোন তারপর টেলিফোন
তারপরও টেলিফোন

আমাদের ঠোঁটের রেভ্‌লন মুখের ফাউণ্ডেশন
কপালের সযত্ন টিপ শুকিয়ে আসে বৈকালের নিমন্ত্রণ বাসি
অতঃপর হে প্রভু
দ্বিতীয় ব্যক্তির চিন্তা আমাদের উন্মনা করে যায়
পুরাতন প্রেমিক বিবাহিত
তরুণদের মাসী সাবর্ডিনেটের আম্মা
বোনের সংসারে নানী এবং বৈকালের নিমন্ত্রণ বাসি

বিলেতি পত্রিকার পাতায় মেগির প্রেম
জ্যাকেলিনের স্তব লিজ টেলরের ছেনালী

বি-বির মাপজোক লোলার লোলুপতা
এবং মেরেলিনের আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যা
হায়রে বৈকালের নিমন্ত্রণ

তারপর হে প্রভু আমাদের রাত্রির শরীর পান্‌সে
জানালার চাঁদ নিরক্ত ব্যবহৃত দেহ
নাকডাকা স্বামী বিনিদ্র রাত এবং ট্রাংকুইলাইজার

হে প্রভু অনন্যোপায় তোমার দিকে মুখ ফেরালাম
আমাদের কোন কাজ দাও
ভ্যানিটি ব্যাগে আয়না ফাউণ্ডেশন আর গ্যালার রঙ
এবং সমাজ সেবা কিণ্ডারগার্টেনের শ্রাদ্ধ অথবা
লেডিজ ক্লাবের সামনের সীট কিংবা
স্বামীর পদাধিকারে শিশু সদনের উদ্বোধন

আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী
হে প্রভু
যে কোন একটা কাজ দাও
নিজেদের নিক্ষেপ করি তার গহ্বরে।

রূপশালি মেয়ে □ চারণকবি বৈদ্যনাথ

ভৈরবীর সারা অঙ্গে যদিও এসেছে নেমে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ
এখনো তবুও আছে তনুর লাবণ্য কিছু আঁটোসাঁটো বুকের সৌষ্ঠব
এবং চোখে ও ঠোঁটে কামনার মৌমাছি—মহুয়ার মন
সিঁথিতে দগদগে লাল সিঁদুরের দাগ
পায়েতে অলক্তরাগ হাতেতে রূপোর তৈরী সাবেকী কাঁকন
'যেদিন প্রথম কলি ফুটেছিল মল্লিকা বনেতে'
সেইদিন জ্বেলেছে অগ্নি স্বামীর চিতায়

কপাল পোড়েনি তার কারণ সে ছিল এক বীর্যহীন নপুংসক লোক—
ইত্যাদি এসব গল্প ভৈরবীর নিজমুখে বলা
বলতে বলতে হেসে ওঠে হেসে লুটোপুটি যায়
ঠিক যেন বালিকা বধূটি
আমি তার দেহে মনে মনের ভেতরে মনে
সেই সব মুহূর্তের ছবি
তন্ন তন্ন করে খুঁজি খুঁজে খুঁজে খুঁজে পাই একটি নির্মল মুখ
কোন এক গাঁয়ে ঘরে ঠিক যেন চেনাজানা মুখ
ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুপূজা দিনে—যে মেয়ের জন্ম হয়েছিল
গাঁয়ে ঘরে যে মেয়েকে ঘেঁটু নামে ডাকতো সকলে।

আহা সেই ছোট্ট মেয়ে রঙচঙে ফ্রকপরা ঠিক যেন
রাঙা প্রজাপতি
সবুজ মাঠের মধ্যে খেলা করতো ছুটোছুটি কানামাছি
কখনো উঠোন জুড়ে বাঘবন্দী খেলা
কখনো বা দত্তদের বাড়ীটার ওপারে শিমুলতলা
তার কাছে ছোট্টনদী শিলাবতী কুলুকুলু ঢেউ
ইঁটকাঠ লোহা দিয়ে দু'হাত বাঁধানো সেতু সাঁকো বলা চলে
তার নীচে মৈত্রদের মথুরের সাথে—বউ বউ খেলা খেলত
মায়ের দশহাত শাড়ী গায়েতে জড়িয়ে।

যখন গাঁয়ের ঘরে সন্ধ্যে নামত পায়ে পায়ে লজ্জাবতী লতা
জোনাকির পিছনে জ্বলতো ঠাকুরদার গপ্পোগুলো
ছেঁড়া ছেঁড়া নক্ষত্রের মতো
পউষের ধানের শিস উঠানে ছড়ানো থাকতো ঠিক যেন গাঁয়েঘরে
এয়োতির হাতে আঁকা মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন নরম আলপনা
তখন সে ছোট্ট মেয়ে কত কী যে স্বপ্ন নিয়ে ঘরে ফিরতো আহ্লাদে অস্থির
চুপটি করে এসে বসতো সন্ধ্যার প্রদীপে মুখ রেখে

মৈত্রদের মথুরের সঙ্গে তার বিয়ে হলে ভারি মজা হবে
মনের মতন বর কুঁতুর বরের চাইতে ঢের ভালো
কাঁচা পাকা আম পেড়ে দেবে
এবং ঘরের থেকে চুরি করে এনে দেবে বাতাসা ও মোয়া
আম আঁটির ভেঁপু দেবে পড়ার বইটা ছিঁড়ে রঙবেরঙ
ছবি দেবে কত কী যে দেবে
বাসুলি মায়ের ওই সিঁড়িটায় ঘসে ঘসে কষ্ট করে
তৈরী করবে তার জন্যে কাঁচপোকার টিপ
ঠিক যেন আকাশের চাঁদ
সেই সব স্বপ্ন আহা সেই সব শিশুমনগুলি
কোথায় হারিয়ে গেছে—যেমন হারিয়ে যায়
সব কিছু দুঃখ সুখ সমস্ত অতীত
শৈশবের প্রিয় মুখ নাক দিয়ে সর্দি ঝরা
জিভে চেটে নোনা স্বাদ নেওয়া
মায়ের কাজল আঁকা ড্যাবকা ড্যাবকা চোখ
এবং বোতাম ছিঁড়ে প্যান্টুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা
ছোট্ট নুনু ছোটখাট লজ্জা ও শরম
যেমন হারিয়ে যায় সুকুমার বৃত্তিগুলি একে একে মুহূর্তের কাছে
তেমনি হারিয়ে গেছে প্রত্যহ হারিয়ে যাচ্ছে অন্তরের অন্তরার সুর।

ছোট্ট মেয়ে ঘেঁটুরাণী ক্রমশঃ চতুর্দশী বয়স ছুঁয়েছে
শহরে পড়ুয়া তার ছোট্ট বর মৈত্রদের মথুর তখন
গাঁয়ের পুজোর দিনে আর কিন্তু চুরি করে ঘেঁটুকে খাওয়ায় না সে
নারকেলের নাড়ু
কপালে আঁকে না আর সুনীল আকাশ থেকে ছিঁড়ে আনা
কষ্টার্জিত কাঁচপোকার টিপ
গরীব শূদ্রের মেয়ে বিয়ে ঢু ঢু তাছাড়া সে বিয়ের বয়সী
অতএব তার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক টিকে না।

এই সব গল্পগুলি ভৈরবীর নিজ মুখে বলা
বলতে বলতে হেসেছিল কিন্তু মুহূর্তে তার মুখের আদল
কী এক বিষাদ এসে ঢেকেছিল
হয়তো আমার চোখে ধরা পড়বে বলে

আবার সহাস্য মুখে গল্পটাকে এগিয়ে দিয়েছে ......

পুনর্বাসন □ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শোন সুনন্দা, ভুলে যাও তুমি চণ্ডীপুরের ঘর,—
ঘর ছেড়ে এসে এই তো হেথায় গড়েছি নূতন গ্রাম,
নিজ হাতে ছাওয়া ছোট ঘরখান দেখায় কী সুন্দর।
শ্রমদান করে রেখেছি আমরা বাঙলাদেশের নাম।
ক্ষেতে ও খামারে লক্ষ্মী মায়ের হাসি উঠিয়াছে ফুটে,
ঘরের লক্ষ্মী তুমি সুনন্দা আলপনা দাও ঘরে,
গোলায় তুলেছি নূতন ধান্য দিনরাত খেটেখুটে,
পুরানো দিনের সুখের ব্যথায় কেঁদো না অমন করে।

বহুদিন পরে অন্নহীনের ঘরে নবান্ন হবে।
বহুদিন পরে গৃহহারাদের গৃহে হবে উৎসব।
বহুদিন পরে জাগিবে হৃধ শিশুদের কলরবে।
ভুলে যাও তুমি হারানো দিনের সংসার বৈভব।
নূতন গ্রামের পথে পথে আজ বহু মানুষের ভিড়,
বুকে হাত রেখে আঁধার রাত্রি জাগিয়া কাটাল যারা
তাদের হাতের হাতুড়ির ঘায় পাথরে ধরেছে চিড় ;
জঙ্গল কেটে নূতন পথের পত্তন করে তারা।

তুমি কি জানো না, দেখ নি কি তুমি বলিষ্ঠ বাহুবলে
পতিত জমিতে লাঙল চালিয়ে বীচন বুনেছে কারা ?
বাঙলার মাটি স্নেহলাবণ্যে ঢেকেছে শ্যামাঞ্চলে
ক্ষতবিক্ষত জীবন কাদের ? হয়ো না আত্মহারা।
ঝাঁপি খুলে দেখ, সোনা দিয়ে মোড়া শঙ্খবলয় দু'টি
শাশুড়ীর দেওয়া সিঁদুর কৌটো, এয়োতির লক্ষণ,—
পর পর আজ সিঁথিতে সিঁদুর, নয়নে উঠুক ফুটি
বিস্মৃতপ্রায় স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুন্দর সুশোভন।

সোনার ফসলে ভরে দেব গোলা গৃহের লক্ষ্মী তুমি,
আয় বরকতে আগামী দিনের শ্রীমন্ত সংসারে
তুমি দিবে আশা ভালবাসা ; আর জননী জন্মভূমি
চির পবিত্র মাটির স্পর্শে আমাদের দু'জনারে
ধন্য করিবে, সার্থক হবে নূতন গ্রামের নাম—
সুনন্দা, শুধু তুমি দিয়ে যাও উৎসাহ অবিরাম।

মেজাজ □ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় করে মালা জপছেন .
বউ
গটগট গটগট করে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া ; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়ীতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ করে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং মালাটা থেমে গেল . এবং চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল

সেইদিকে ঢলে পড়লো।
নিজের চোয়ালটা সামনে ঠেলে দাঁতে দাঁত লাগলো।
বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে পরমুহূর্তেই শাশুড়ির
দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়ীটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষ ঘিঁষ ক্যাচর ক্যাঁচর শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে আবার চলতে লাগলো।

নাকে অস্ফুট শব্দ করে থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল
হঠাৎ মালাটার গলা টিপে ধরলো।
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফর্সা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রস্তাড় দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?
এবার মালাটাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে
ঐ সময়ে কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল।

ভাসুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাতো।
কেন ? অসুখ করে মরলে কী হয় ?
ডেঁটী আর বলেছে কাকে !

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে কালো বউ
গটগট গটগট করে সামনে দিয়ে চলে গেল।
নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা'---
'বলুন।'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায-দেওয়ার মত নয়,
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে ?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায়নি ?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায় থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে ;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে রাস্তায় মেয়ে দেখছে :
ফরসা ফরসা মেয়ে—বউদির মতো ভুশুণ্ডি কালো নয়।

বালতি ঠনঠনিয়ে বউ যেন মা কালীর মত রণরঙ্গিনী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।
শাশুড়ির কেমন যেন হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগলো।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন ঃ আচ্ছা থাক, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু করে
গটগট গটগট করে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর রাত্রে বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এলো—
বউ বলছে : 'একটা সুখবর আছে'।
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা ; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।'

এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :
'কী নাম দেব, জানো ?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'

অন্তঃসত্ত্বা □ কেদার ভাদুড়ী

অন্তঃসত্ত্বা সেও ছিল মনে হয় কয়েক মাসের
ব্যবহিত বুক নিয়ে হাঁটতো চলতো কথা বলতো বেশ
চোখে দিত মৃদু দৃষ্টি মনে হতো এই সেই মেয়ে
এই সেই মেয়ে সেই চিরদিন অন্তঃসত্ত্বা থাক

অন্তঃসত্ত্বা সেও ছিল মনে হয় কয়েক মাসের
জুন থেকে ডিসেম্বর বলতে গেলে প্রায় সাত মাস
নিতম্ব দুলিয়ে প্রশ্ন ঢেকে দিত বিস্ময়সূচক
জ্ঞানী গুণী বোকাপাঁঠা তাই পেয়ে অস্থিরতাময়

এই সেই মেয়ে সেই চিরদিন অন্তঃসত্ত্বা থাক
বিস্ময় বালিকা এই আহা এই অঞ্জন সেনের
জুন থেকে ডিসেম্বর বলতে গেলে প্রায় সাত মাস
অন্তর্বাস খুলে ফেলে দিয়েছিলো অনর্ঘ্য উত্তাপ

কেউ যদি প্রশ্ন করে, আহা বলো, সে মেয়ে কোথায়
হৃদয়ে আঁতুড় ঘর অন্তঃসত্ত্বা হৃদয়ে আতুর

বিদিশা □ রাজলক্ষ্মী দেবী

বিদিশা রবীন্দ্রনাথ পঠন-পাঠন করে ; বিদিশা জানে না
প্রেমের প্রথম পাঠ। নিত্য বিদ্যাপীঠে, অবসরে
বিদিশাকে লক্ষ্য করি সার্ত্রে, কামু, স্টাইনবেক পড়ে।
অথচ বিদিশা এই জীবনের মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম লেনাদেনা
নিয়ে তুলো ধনুবে না, ধান ভানবে না। যেন মোড় ঘুরলেই
ফুটপাত, বাড়ি। পোষা জানোয়ার নিয়ে সকাল-বিকেল
আহ্লাদী পুতুলখেলা। বিদিশা জানে না প্রশ্ন, পরীক্ষা, পাশফেল।
বিদিশার জন্যে যেন নিশ্চিন্ত চাকরি আছে দিন ফুরোলেই।
বিদিশা মা-বাবা, ছোট ভাইবোন, খেলা, ঝগড়াঝাটি,
হাসিকান্না,---এই সব পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুর বন্যায়
তীরঠাসা হয়ে আছে। তার মন পবনের নাও
পাল গুটিয়ে ছিমছাম উপন্যাস কবিতার ঘাটে।

এ হেন বিদিশা কারো কুক্ষিগত হয়ে যদি হাঁসফাঁস করে,
দুঃখের সংগেই—আমি তখন শোনাবো কিছু সত্য কথা তাকে
নিঃশ্বাস-বায়ুতে যদি অধিকার চাইতে—জানালাকে
তাহলে দিতে না ঢেকে অতি সূক্ষ্ম বুনোটের ঠাসাই চাদরে।

মেয়ের চিঠি □ বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মা, আমাকে আশীর্বাদ কর,
তোমার মেয়ে আজ সুখী হতে চলেছে :

যাকে ভালোবাসি তার বয়েস চব্বিশ,
ভারি সুন্দর, মুখে মিষ্টি হাসি।
আর কী রাগী!
অমনি তেজী ছেলেই মা, আমার পছন্দ।
সে আমায় ভালোবাসে, খ্-উ-ব ভালোবাসে।
পৃথিবীটা কি সুন্দর, মা!

রাত্রের আলোকমালা গলায় দোলানো নাগরী নগরীর উষ্ণ নিমন্ত্রণ,
উজ্জ্বল হলুদ ফুলের ঝুরি সোনাঝুরির ডালে,
বাগানে ফোটা একটি মাত্র লাল গোলাপ,
আমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুখী আমি।

আহা মা, সন্ধ্যেবেলার একটি তারা যেমন টেনে আনে
আকাশ ভরা তারার মেলা, চাঁদ, চাঁদের আলো,
অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে আলোর পর্দা খুলে যায়,—
আমার মনে সুখের পরতে পরতে অমনি পাপড়ি খুলে যাচ্ছে,
আর আমি জেগে উঠছি গভীরতায়—
আদিম এক চিত্রলোকের মাঝখানে।

এই গর্ভে আসবে তার সন্তান,
আমি মুকুলিত হব ফলভারে হেমন্তের সুখী বৃক্ষের মত
একমাত্র আমিই তাকে অমর করতে পারি।

মা, আমাকে আশীর্বাদ কর।
তোমার মেয়ে আজ সুখী হতে চলেছে ॥

পৌত্তলিক □ অরবিন্দ গুহ

ভালোবেসেছিলাম একটি স্বৈরিণীকে
খরচ করে চোদ্দ সিকে :
স্বৈরিণীও ভালোবাসা দিতে পারে
হিসেব মতো উষ্ণ নিপুণ অন্ধকারে :
তাকে এখন মনে করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

কি নাম ছিলো? সঠিক এখন মনে তো নেই;
আয়ুর শেষে স্মৃতি খানিক খর্ব হবেই।
গোলাপী? না তরঙ্গিনী? কুসুমবালা?
থাকগে খোঁপায় বাঁধা ছিল বকুলমালা,
ছিলো বুঝি দু-চোখে তার কাজলটানা :
চোদ্দ সিকেয় ছুঁয়েছিলাম পরীর ডানা :
এখন আমি ডানার গন্ধে কৌটো ভরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

অন্ধ কিছু দেখে না, তার কণ্ঠ পারে
ফুল ফোটাতে অন্ধকারে।
অন্ধকারে যে গান বানাই একলা হাতে
সুদূর সরল একতারাতে

সে গান কোথায় ভাষা পেল, স্বচ্ছ ভাষা ?
মূলে আমার চোদ্দ সিকের ভালোবাসা।
জলের তলে মস্ত একটা আকাশ ধরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

কখনো এসে পড়ে যদি □ গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমনের সাথে তুমিও কখনো এসে পড়ো যদি
দায়মল-কাটা রঙীন বিকেলে
পায়ে লাল মখমল চটি, আলোয়ান গায়ে,
হেনার বেড়ার ধারে লনে মুখোমুখি বেতের চেয়ারে বসে
আইভরি টি-সেটের চায়ের মৌতাতে দুটো কথা হবে।

স্মৃতি—সে তো যাদুঘর নয়,
নদীর মতন স্মৃতি বহতা জীবন
বকুলের মতো ঝরে ঝরে ঘুমতলা ছেয়ে থাকে,
সে সব কুড়িয়ে মালা গাঁথা কিংবা
কোনো হাইকিং পাহাড়ী হ্রদের নীল জলে
ডুবুরির মতো শুক্তি খুঁজে আনা
সুমনের তোমার আমার দিনগুলি
চিনেবাদামের মতো খুটখাট ভেঙে থৈথৈ লনের জাজিম।

প্রিয়-শরীরের গন্ধমাখা তোমার শরীর
হাসনাহানার মতো মনে হবে সেদিন বিকেলে
সুমনের ঘ্রাণ তোমার নিঃশ্বাসে মিশে
ভ'রে দেবে মৃতদার আমার বাগান।

বিভ্রান্তালাপ □ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি যে ওদের সামনে ভুল সুরে গান গাইলে
ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটলে—ব্যাপার কী ? তোমার
শরীর অসুস্থ নয়—তুমি নও নির্বোধ বালিকা !
অবশ্যই বোকো—পরে খবর দেবেন মানে পছন্দ হল না।

তিনবার হল এই কাণ্ড, আমরা বুঝতেই পারছি না—কী ব্যাপার !
এই সেদিনই স্পষ্ট বলেছ বৌদিকে
মনোনীত কোন মুখ নেই যার প্রতীক্ষায় আছ,
তুমি কারো প্রার্থনার সম্মুখীন নও, কারো
গৃহদেবালয় দেখনি। তা হলে,
মেঘের মতন ভারী বিষণ্ণতা কেন ?
তোমাকে দেখে তো
পুরুষবিদ্বেষী বলে মনে হয় না, যুবাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে
আমরা জানি !

যৌনতা সম্পর্কে কোন ভয় নেই তো, ঘৃণা ?
অথবা হীনতাবোধ রমণীর দাম্পত্য জীবনে ?
প্রতি পূর্ণিমায় স্তন ব্যথা করে ওঠে না, স্বপ্নেও
জাগে না কোমল মুখ দুর্গন্ধ ছাপিয়ে ?

তবে সম্ভবত
আধুনিক পদ্য পড়ে উদাসীনতার ব্যাধি ধরেছে তোমাকে
জীবন টানছে না বুঝি অদৃশ্য রহস্যে, কোনো লোভ
মেঘের ভিতর টর্চ ফেলে বুকে শব্দ বাজাচ্ছে না—
অর্থহীন মনে হচ্ছে যুদ্ধ সন্ধি আত্মসমর্পণ

গৌরী, তুমি মেয়ে—
যুক্ত হয়ে থাকা, জানো, মেয়ের স্বভাব।

আধুনিকতার যক্ষ্মা। ভিক্ষুক ও কবিদের মানায়, কেন না
ওদের সর্বস্ব গেছে—ওরা ক্ষমাহীন, ওরা একা,
ওরা সংক্রমণ জানে—ভীষণ শয়তান।

গৌরী, তুমি মেয়ে, তুমি কোমলতা, কেন
নির্ভর ব্যতীত একা ভ্রমণে ইচ্ছুক ?
বিশ্রাম নেবে না ?
ছায়ায় কোমল ঘাসে শিশিরে পা রেখে
বৈষ্ণবীর মতো তুমি কোনোদিন বিশ্রাম নেবে না !

অফিস ফেরৎ সেই তরুণীর উদ্দেশ্যে □ ফণী বসু

তার জঙ্ঘায় ও উরুতে আমি এক দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখলাম
ধারণের বহনের।
বারবার চরিত্রহীন সময়
তার স্তনে ও শরীরে দেনা পাওনার ক্লেদ ঝরায়
হাতের ছোট্ট রুমালে মুখ ঘষে ঘষে
পরিপার্শ্বকে আনন্দ দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।
তবুও জঙ্ঘায় এবং উরুতে
ধারণের বহনের
এক সাহসী ইঙ্গিতের নিমন্ত্রণ পত্র লেপটে আছে !

অফিস ফেরৎ বাসের দণ্ডায়মান। সেই ধরিত্রী
বারবার রূপের পুনর্বিন্যাসে কাল পরশু এবং পরের দিন
এবং তারপরেও ঝুলে থাকবে স্বর্গের হাতল ধরে অথবা স্বপ্নের
কেন না—
বর্তমান ও অতীতের কুৎসিৎ কচ্ছপ সময়—
তার বুকের পিঠের স্বাস্থ্য খামচে খামচে নিলে পরেও

এই পত্রঝরা যুবতী-বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়
অনাগত ফুল ফোটাবার দরিদ্র প্রস্তুতিতে।
তাই না লুটেরা আশপাশ তার প্রত্যেক লোমকূপ শুষে
বুকের পিঠের প্রাচুর্য কেড়ে নিয়ে যায়
ঘামের স্রোতে স্রোতে। তবুও অফিস ফেরং সেই রমণী
ক্ষয়িষ্ণু উরু এবং জঙ্ঘায় ধারণের বহনের নিশ্চিত ইচ্ছায়
ঝুলে থাকে
চলন্ত বাসের একটি পিছল হাতল আঁকড়ে ধরে
স্বর্গের অথবা স্বপ্নের।

নীরার হাসি ও অশ্রু □ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নীচে
টলমল
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলিমাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি :
নীরা, তুমি শান্ত হও।
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই

তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও।
নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ!
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টলমল্।

হাসপাতাল □ শঙ্খ ঘোষ

নার্স ১
ঘুমোতে পারি না, প্রতি হাড়ের ভিতরে জমে ঘুণ
পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণু বিস্তার
ঘূর্ণমান ডাক দিই কে কোথায়, সিস্টার সিস্টার—

'হয়েছে কী? চুপ করে নিরিবিলি ঘুমিয়ে থাকুন।
তাছাড়া নিয়ম মতো খেয়ে যান ফলের নির্যাস—'
শাদা ঝুটি লাল বেল্ট খুটখুট ফিরে যায় নার্স।

নার্স ২
রাত দুটো। চুপি চুপি দুটি মেয়ে ঢুকে দেখে পাশের কেবিনে
ম্রিয়মাণ যুবাটির আরো কিছু মরা হল কিনা।

'এখনো ততটা নয়' ঠোঁট টিপে এ ওকে জানায়।
তবে কি ঘুমোচ্ছে? না কি জ্ঞানহীন? ডাক্তার দরকার?'

'থাক বাপু'—ফিনফিনে ফিঙে তুটি ফিরে চলে যায়
'আমরা কী করতে পারি ! যার যার ঈশ্বর সহায় !'

নার্স ৩
তুজন আছেন ওই অ্যাপ্রনসুন্দরী
অ্যাপ্রনের নিচে রেখে হাসি
মুখে মরুভূমি নিয়ে নিয়মিত ভোরে
বিছানা সাজান বারো মাসই
যদি বলি—'চাদরের আমিও কোণ ধরি'
আমাকে দেবেন ঠিক ফাঁসি !

নার্স ৪
হাসিও ছিল বারণ
মুখে তাকাই না, কারণ
তাকালে মুখে রোগীর বুকে
রক্ত সমুৎসারণ !

ধরেছি বটে নাড়ী,
কপাল ছুঁতে কি পারি ?
এক ঝাপট-এ মাথায় ওঠে
ছেলে থেকে বুড়ো ধাড়ী !

জুলেখা ডবসন □ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছিলো অনেক রাজার বাড়ি চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হ্রদে সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডবসন।

ঈশান কোণে অমনোযোগে   মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে
হুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন
চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে   মনোস্থাপন করি ভিক্ষে
তোমার জন্য জ্বলেখা ডব্‌সন।

সুধাদি □ সুনীল মুখোপাধ্যায়

আমের মুকুল মাড়িয়ে চলে যায় সুধাদির বয়স
দলমা পাহাড়ের আগুনের মতো খাঁ খাঁ করে সুধাদির বুক
চৈত্রের হাওয়ায় উড়ে-আসা শুকনো পাতা ও খড়
তার শাড়ির আঁচল ছোঁয়, চুল ছোঁয়, ছোঁবে স্তন ;
কবে স্বপ্নের দেশে তার উড়েছিল নীলবর্ণের পতাকা
কোথায় পথের পাশে ফুটেছিল কৃষ্ণচূড়া
কিছুই পড়ে না মনে সুধাদির,
কাঁঠালমুচির ঘ্রাণে এখন শুধু বমি আসে, হাই তোলে·····
স্বপ্নহীন ঘুমের জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে করতে
অদ্ভুৎ আঁধারের দিকে ছুটে যায় সুধাদির যৌবন।

আমি জোড় হাতে, ক্ষমা করো □ দেবী রায়

বনশ্রী, ব্লাউজের টিপকল খুলে মন্দিরার আওয়াজ শোনাবে না ?
বনশ্রী, বড় ভালো লেগেছিলো সেদিন বডিজের হুক খুলে দিতে
ছোটাছুটি এই জীবন   এই জীবন সাদামাটা
এই জীবন রিহার্শাল   বড় ছোটো এই জীবন
এই জীবন, এক জীবন   অভিজ্ঞতা অর্জনেই ফুরিয়ে যায়

ইদানীং রোজ সকালে আমার মাথা ধরে কান্না পায় রাত্তিরে
আমার ও মৃত্যুর দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার
বজ্রসহ বৃষ্টিপাত, মনে পড়ে কেন বজ্র, বৃষ্টি অসময়
বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের ভিতর নিবিড়, সতর্ক অন্ধকার
কেন সমস্ত জীবন জুড়ে এতো ক্রোধ, এতো ক্রোধ?
কেন এই বিপুল রক্তের মধ্যে ভয়াবহ ডেকে ওঠে বজ্রমেঘ
তৃষ্ণা ও হাহাকার কেন এত বিশাল ব্যাপক
মাথা হেঁট হয়ে আসে কেন এই নীরব অন্ধকারে
কেন নিত্য গুমরে-মরা কেন অলক্ষ্যে হাতড়ে ফেরা
কেন অন্ধপথ, পায়ের নীচে পিছলে যায়
দারুণ কুয়াশায়
প্রতিহিংসা কার? ভিক্ষুক, সর্বস্ব হারিয়ে আমি
জোড়হাতে আজ ক্রূর-কৃতঘ্নতা; অন্ততঃ আজ ক্ষমা করো
আমি জোড়হাতে, ক্ষমা করো ক্ষমা ক্ষমা
বনশ্রী, আমার হাত ধরো—
কংক্রিট ফুটপাত পায়ের নিচে পড়ে থাক
গা-ঘেঁসে, ভীড়—মিছিলের স্রোত মনুমেন্টের নিচে
অথবা অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত ময়দানে যাক
মহাশূন্যে, সর্বনাশ হোক এই নীচ পৃথিবীর
বনশ্রী, আমার হাত ধরে টেনে তোলো
প্রাকৃতিক ও নিয়ন জ্যোৎস্নায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
যায়—ভেসে যায়
মানুষের পুলিশের চোখের আড়ালে অধৈর্য ভালোবাসা
আমি কাঙাল, লুট করো
শরীর শরীরের বিনিময়ে হোক পক্ষপাতহীন সহাবস্থান
ভুল ভুল ভুল শরীর! শরীর!
বনশ্রী, তোমার জটিল মন কে চেয়েছে?

এক তুমি-ই জানো—তিরস্কার পুরস্কারে, আমি নির্বিকার
তুমিই জানো—আমি নির্বিকার, সম্মান—অপমানে
লুটোপুটি দীঘার ঢেউয়ে জ্বেলেছিলে—ফসফরাস
তুমি আগুন
বনশ্রী, আমার হাত ধরো··· ··
বনশ্রী, ব্লাউজের টিপকল খুলে মন্দিরার
আওয়াজ শোনাবে না ?

উদ্ধার □ অমিতাভ দাশগুপ্ত

হাঁটুর ওপর ছেলে পেতে
স্নান করাচ্ছে নীহারবালা।
এই ছবিটিই দু'চোখ ভরে জড়িয়ে থাকে ;
অন্যথায় তো ভস্মলোচন
মন্দ বই সে দেখতে পায় না,
মনের বিষে দগদগে নীল চোখের মণি
দিনরাত্তির গলি তস্য গলি
হন্নে কুকুর হয়ে খোঁজা
ঢালু কোমর, আধখোলা বুক, জানলার যক্ষিণী।
ভাগ্যি একটা পুকুর ছিল
যে ঢাকে সব রৌদ্রপ্রখর জ্বালা,
একটি স্নিগ্ধ তৈলচিত্র
হাঁটুর ওপর ছেলে পেতে
স্নান করাচ্ছে মগ্ন নীহারবালা।

পরী □ নবীন সুর

মাঝরাতে পরী এসে বসেছিল স্বপ্নের উঠোনে।
তার দু'টি শঙ্খহাতে বাটা হলুদের কাঁচা রঙ,
কপালে ধ্যাবড়া টিপ ঝুরো চুলে অস্ত যায় যায়।
ব্লাউজ জ্যোৎস্নায় বুদ্ধ, চিনিরঙ রাজাশ্রী পিঠের
শিরদাঁড়ার গভীরতা ঘামে লেপ্টে একমাত্র ত্বকে।

ছড়ানো পায়ের পাতা, উবু তানপুরার যন্ত্রখানি
কে বাজাবে মাঝরাতে অলৌকিক শিল্পের আঙুলে?
যতো শুরু, কবে তার সবটুকু দীপ্র নান্দনিক?
নষ্ট ঘুম, থেঁতো স্নায়ু, নেঙড়ানো অস্থি-মজ্জা-হাড়;
কদাচিৎ গান হয়ে বেজে ওঠে বুনো রত্নাকর!

সহস্র আলোকবর্ষ মরামরা মন্ত্রের কুহক—
খয়েরি স্তনের কেন্দ্র, তীব্রস্পর্শ মুক্তনাভি, গ্রীবার চূড়ায়
জিমল মুখের সর গর্জনতেলের ত্রিমাত্রিক অহংকার—
মহানবমীর ঢাকেঢোলে ডেকেছিল জঙ্ঘার কাঞ্চন।

চেটোয় আটার দাগ, রাঙা মুখে ঝিঁক উপচে রুটি স্যাঁকা তাত;
কোমরে চাবির গোছা, তেলচিটে মেঝের রান্নাঘর ছেড়ে
সাদা পরী উবু হয়ে বসেছিল আমাদের শিল্পের উঠোনে।

প্রসাধনরতা : কোনার্ক □ নবীন আদক

দর্পণে দর্পিত দেহ, বর অঙ্গে পুষ্পিত যৌবন
প্রসাধনরতা নারী সময়ের সমান বয়সী,
করতলে নিজবিম্ব স্পন্দহীন সলজ্জ মোহন
অমল সৌন্দর্যে জ্বলছে মন্দিরের মৌন দেবদাসী।

দু'চোখে সমুদ্র স্থির, ভ্রূযুগল দিগন্তের রেখা,
বন্ধমুখ ঝিনুকের মতো ওষ্ঠ, চিত্রিত অধর,
বুকের কলস কাঁপছে দেহের নদীতে, শুভ্র বাঁকা
কটিতটে নীবিবন্ধ চঞ্চল বাতাসে থরথর।

বিজন সৈকতভূমি, মানুষের পদচিহ্ন মুছে
দিয়ে গেছে মহাকাল। শ্মশান-বৈরাগ্য আনছে হাওয়া।
শতাব্দীর বালিঝড় সুন্দরের মুকুট কেড়েছে
নিষ্ঠুর দু'হাতে আর রেখে গেছে দুঃখময় ছায়া।
কালের দর্পণে তবু সূর্যসখী সাজছে বিলাসিনী,
নৈঃশব্দ্যের কান্না আনছে সহচরী মন্দিরাবাদিনী॥

মা ▫ শামসুর রাহমান

ছিলেন নিভৃত গ্রামে। সর্বক্ষণ সংসারের খুঁটিনাটি কাজে
মগ্ন, আসমানে রৌদ্র কাঁপে, মেঘের পানসি ভাসে, কখন যে কটা বাজে
থাকে না খেয়াল কিছু। দৃশ্য খুবই চেনাশোনা, মৃদু রঙমাখা,
নানা সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা ; চুলায় চাপানো হাঁড়ি, পুঁইশাক ঢাকা
মাছ পড়ে গোটা দুই শিক্ষক স্বামীর পাতে। লাউয়ের মাচায়
কখনো রাখেন চোখ, কাঁঠাল গাছের ডালে হলদে পাখী লেজটি নাচায়
ঘন ঘন, বেলা বাড়ে। ইঁদারার পানিতে গোসল সেরে কাঁচাপাকা চুলে
চালান কাঁকই আর ভাবেন খোকন স্কুলে
নামতা মুখস্ত করে। বৈয়মে রাখেন নক্সী পিঠা, মনে পড়ে
বড় ছেলেটির কথা, চোখ যার বড় বেশী জ্বলজ্বলে, পড়াশোনা
করে যে শহরে

এ বাড়ির গণ্ডি ছাড়া কোথাও পড়ে না তাঁর পায়ের পাতার
কালো ছাপ, সারাক্ষণ থাকেন আড়ালে আর খসে না মাথার
কাপড় ভুলেও কারো সম্মুখে কখনো। বেঁচে নেই বাপজান,
আম্মাও ওপারে আজ, তবু মাঝে মাঝে প্রাণ করে আনচান।

ক্রুদ্ধ দেবতার মতো তোলে মাথা সারাদেশ।
কতো যে খবর আসে, কতো আত্মদান
রাঙায় দেশের মাটি ; সন্তানের রক্তমাখা জামার আহ্বান
টানে গ্রাম্য জননীকে। অনেক পেছনে রইলো পড়ে
লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ,
কলাইয়ের ক্ষেত আর পুকুরের ঘাট।
পড়ছে পায়ের ছাপ আজ তাঁর জনপথে, আনাচে কানাচে, সবখানে,
মেলালেন পুত্রহীন হৃদয়ের দীপ্ত কান্না শ্লোগানে, শ্লোগানে।

একদা এক নদী □ আল মাহমুদ

তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
বুকে আমার জলের ধারা তোলে ;
সামনে দেখি ভরা ভাতের থালা
ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।

পিঠার মতো হলুদ মাখা চাঁদ
যেন নরম কলাপাতায় মোড়া ;
পোড়া মাটির টুকরা পাত্রকে
স্মৃতি কি ফের লাগাতে পারে জোড়া ?

নীল বইচা মাছের মতো চোখ
স্বপ্নে আমায় কুশল পুছে রোজ—
'ভালো কি আছো ?' হায়রে ভালো থাকা
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ !

ফিরতে চাই, পাবো কি সেই পথ
তরমুজের খেতের পাশে ঘর ;
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থর থর।

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাতবরণ রূপসী সেই পরী,
কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লাভরা পানি,
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী—

উঠতো হেঁটে জলের ধার বেয়ে :
কালো বাউশী যেনো কলমী বনে
অঙ্গ নেড়ে অস্ত গোলা জলে
দেখেছিলাম একদা কুক্ষণে।

ফিরলে আজ পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙ্গা সে এক গ্রাম ?
হায় রে নদী খেয়েছে সব কিছু
জলের ঢেউ ঢেকেছে নামধাম

মধ্যপ্রাচ্য □ আবুল হোসেন

দুপুরবেলা চেয়ারে শুয়ে পড়ছিলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা
'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'
দ্রুত ওঠানামা করছিল বুক অসহ্য আবেগে।

ইরাণী মেয়েটি এসে দাঁড়ালো সম্মুখে ঃ
চেঁড়া ঘাঘরা, রুক্ষ চুল, দু'চোখে কালির দাগ।
বই ফেলে চাইতেই, হেসে উঠলো ফাটা ঠোঁটে,
দেখলাম—কপোলে টোল পড়ল না,
চোখে বিদ্যুৎ ঝলকায়নি তার,
অসংকোচে কাছে এসে হাত পাতলো।
ইরাণে যাইনি, আরবেও না।
মরুদ্যান আমি দেখিনি সে দেশের।

শুনেছি সে দেশ আঙুরের আপেলের,
বাদাক্‌শনের নীলার কথাও জানি,
শুনেছি সে দেশ সুরায় ও সাকিতে মশগুল ;
রুবাই পড়েছি খৈয়ামের হাফিজের—
খোয়াব দেখেছি শাহ্‌রাজাদের মতো অপরূপ সুন্দরীদের !

আজ দেখলাম ছেঁড়া ছিটের ঘাগরা-পরা তার মোহিনীদের—
আনার আর গোলাপের দেশ ছেড়ে
হাজার হাজার মাইল হেঁটে এসে
বাতিল ঢাকার খোয়া-ওঠা অলিতে গলিতে
ফেরি করে ছুরি-কাটা নিষিদ্ধ আফিম আর বাঁকা চাউনি ॥

মণিমালা □ রূপাই সামন্ত

হতাশায় বালিয়াড়িতে পা ডুবে যায়—
সবই এখন বড্ড বাসি বড্ড পুরোনো
লুকোনো মাধুর্য নেই কোন বাঁকে—ঝাউছায়ায়
সী-বিচ হোটেলের অন্ধকারে
কারুময় লাল কাঁকড়াচলা সৈকতরেখায়
মুক্তাহীন শুকনো শুক্তির মতো পড়ে আছে স্মৃতির কণিকা সবখানে ।

নিদারুণ সৌন্দর্যে ওড়াউড়ি-করা সমুদ্রকপোতেরা শুধুই ওড়ে
মৎস্যলোভী হাওয়ায়
আর আকাশডাকা শব্দে ঢেউ আছড়ে পড়ে বৃথাই—
কেউ সাড়া দেয় না ।
আজ সমুদ্র শুধু শব্দ আর শব্দাড়ম্বর আর নীল জলের মরুভূমি ।

অথচ আমার হৃদয় আমি একদিন এখানেই দেখেছিলাম
এই দীঘার সমুদ্রে—এমনই উত্তাল
দীঘল অবসরের মুঠিতে ধরেছিলাম মণিমালার হাত ।

ভেবেছিলাম
সুপেয় জলের মতো দু'টি শ্যাম চিক্কণ অধর ওষ্ঠে
পান করার বিরতিতে আছে শুধু সফেন উচ্ছ্বাস।
চাঁদ উঠলে আমার কপালে আঙুল রেখে
সে বলেছিলো—
'ছিলাম অন্যমনা, তুমি এলে তাই দেখা হল সমুদ্র,
দেখা হল নিজেকে, দীঘার সমুদ্রে হল নবজন্ম
নিভৃত বিবাহ মন্ত্রের গুঞ্জনে,
দীঘার সমুদ্র এই মন—তুমি স্থির বিশাল সৈকত'
আমি বলেছিলাম—'চল আবার স্নান করি'।
সেই জ্যোৎস্নায় তিনটি সমুদ্রে আমরা স্নান করেছিলাম ঃ
রূপের সমুদ্রে, সুখের সমুদ্রে, ভালোবাসার সমুদ্রে

তারপর দীর্ঘ এক যুগ—মৃত্যুর নিয়মে গেছে মণিমালা।
দীর্ঘশ্বসিত দীঘায় আজ শুধু বিষণ্ণবাক বালি আর
বেদনার ঝাউঝড়ে স্মৃতির কম্পন।
মৃতার আত্মার মতো এ কবিতা কবিকে করেছে এক
ভগ্নহাল বিদীর্ণ জাহাজ।
হায়,
দুঃখী চাঁদ তবু ওঠে দীঘার ভুবন ভরে সোনালি সৈকতে ॥

মণিমালার সংসার □ সামসুল হক

কোথায় সংসার পাতবে, মণিমালা, স্বামী কি ভীষণ প্রয়োজন ?
সন্তান-সন্ততি চাও ? কিন্তু এই পৃথিবীতে বাঁচার প্রক্রিয়া
সহজ-সরল খুব, মণিমালা, জটিলতা চাও কেন তুমি ?

পৃথিবী ঘুমের মতো, পৃথিবী একার মতো, যৌথ কেউ নেই।

পৃথিবীর জলবায়ু, তোমার একার সব, শুধু তাই নয়—
অন্যান্যের জন্ম মৃত্যু দুর্ঘটনা প্রেম সব তোমার দায়িত্ব ;
সব ঘোর মিথ্যা জেনো পৃথিবীর কাল্পনিক সমস্ত সংশয়।

মণিমালা, পৃথিবীতে দৈব-সিদ্ধান্তের মতো তুমি বেঁচে যাও।

রুণু □ উত্তম দাশ

তোমার ভেতর ঈশ্বর আর কি কি দিয়েছেন, রুণু
একই শরীরে তুমি হাজার বার জন্মালে
একটা জন্ম চেনার আগেই তুমি জন্মান্তরে চলে যাও
পেছতে পেছতে আমি ন'শ নিরানব্বই জন্মের ওপারে পড়ে আছি
তোমার শেষ জন্মে কবে পৌছবো রুণু
পৃথিবীর শেষ চেতনা একদিন লুপ্ত হবে
মানুষ থাকবে না, মহাশূন্যের মধ্যে
ভয়ানক পরাজয় গিলে ফেলবে আমাদের
অস্তিত্বহীন আমি কোন্ দিক থেকে
তোমাকে চিনতে শুরু করবো রুণু
আমাকে জানতেই হবে
ঈশ্বর তোমার মধ্যে আর কি কি দিয়েছেন ॥

চেনা মুখ □ অশ্বিনী কর

আমি তার পরিচিত এই মাত্র শুধু পরিচয়
কোনকালে ছাত্রী ছিল অন্য কিছু আত্মীয়তা নয় :
মাঝে মাঝে দেখা হয় ছুটে চলা রিক্সার উপর
প্রতিবার হেসেছে সে প্রতিষ্ঠিত যৌবনে ভাস্বর।
কৌমার্যের আলো মেখে শব্দে ছন্দে গন্ধে মধুময়
চেনামুখ মিষ্টিমুখ লজ্জানম্র সৌন্দর্যে বাঙ্ময়।

প্রতিদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি বিরক্তি চঞ্চল
সৌন্দর্যের প্রতিভায় তবু মেয়ে স্নিগ্ধ অচপল ;
হঠাৎ দেখেছি তার লাল টিপ সিঁথিতে সিন্দুর
লজ্জা রাঙানো মুখ—মনে ভাবি চলে যাবে দূর।
বিবাহের আয়োজনে ছিল না আমার নিমন্ত্রণ
স্নেহাশিষে মাঙ্গলিকে ভরে দিই একান্ত গোপন।
দেখেছি স্বামীকে তার মনে হয় অচেনা প্রবাসী
মেয়েটির সারা মুখে ঝরে শ্বেত করবীর হাসি।
দেখা হলে মনে হয় কিছু তার আছে বলবার
সেই কথা শোনবার আমার কি নাই অধিকার !
দেখেছি সন্তানে তার রাস্তা দিয়ে পা-পা হেঁটে যায়
শুধু তাকে দেখি নাই খোঁপা কিংবা জড়োয়া সজ্জায়।
হাসি মুখে অভ্যর্থনা আজো পাই নিঃসীম নিষ্ঠায়
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে জীবনের চেতন সত্তায়।

রাণীর খোঁজে □ বারীণ ঘোষাল

সেখানে এক রাজ্য আছে
রাজা আছে মন্ত্রী আছে
বরাবরের শয্যা আছে
সেজেগুজে সাতমহলা হাজার বাড়ী
সব পেরিয়ে রাজার নকীব চেঁচিয়ে বলে—
সুমনা, কেমন আছো ?

দূর, তখন বুক ঢিপঢিপ অনেক কিছুই নয়

সেখানে এক রাজা আছে
পুলিশ আছে বস্তি আছে
এমন উত্তেজনাও আছে
মনের ভেতর চোখের ভেতর
হাঁটু বেয়ে জল গড়াবে

সব ছাড়িয়ে রাজার নকীব গুমরে বলে—
সুমনা, কেমন আছো ?

দূর, ওসব দুঃখ টুঃখ অনেক কিছুই নয়।

সেখানে এক রাজা আছে রোশনাইয়ে আলোয় আলো
প্রজা আছে সৈন্য আছে
গাছগাছালির রোদ পোয়ানো সবুজ আছে
রাজামশাই রাণীর খোঁজে কেমনতরো
নকীব ভায়া রাণীর খোঁজে কেমনতরো
ফিসফিসিয়ে কান্নাকাটি সেরে বলে—
সুমনা, কেমন আছো ?

দূর, সেগুলো আকাশ বাতাস অনেক কিছুই নয়।

সুমনার ক্ষিদেই ভালো
চোখের ভেতর বৃষ্টি বড়
মনের ভেতর বড্ড গরম
সুমনার শীতই ভালো।

আথিনা এবং আমি □ কমল তরফদার

কয়েকটি গ্রীক দেবী রয়ে গেছে এ শহরে।
বাকিরা গেছে সব অস্ট্রেলিয়া নয়ত কানাডায়।
আমি বলি, আথিনা, সদয় হও,
এসেছ যদি এ দুরন্ত ঘূর্ণির কাছে তবে
তোমার ধূসর চক্ষু হতে আমাকে দাও কিছু আগুন
আগামেমননের গর্ব ভাঙি চুরি,
শিল্পের মন্দিরে রেখে যাই কিছু কারুকাজ।
সে দেবীর টিকোলো নাক, খাঁজকাটা চিবুক, বর্ণ পাকা গম,
হেসে বলে—তোমাকে দিচ্ছি আমি টিনের বিস্কিট, তুমি খাও,

আর বল চাকরিতে পাকা হব কি উপায়ে ?
তুমি কি আনতে পারো বায়ু অনুকূল ?
শুধু মাত্র বায়ু নয়, আমি নিয়ে আসি
বায়ুবেগে সমুদ্রের ঢেউ, ফেনিল মুকুট,
রণক্ষেত্রে ছুটে আসা লক্ষ লক্ষ শরের গর্জন,
আফ্রোদিতি, প্যারিসের সৌন্দর্যচেতনা।

আথিনা অপূর্ব হাসে। চোখের ধূসর
ক্রমে হয়ে যায় নীল, সমুদ্র সকাম কিংবা আকাশের প্রেম
আমার পোশাক নীলে মিলে যায়। মিলে যায়
গ্রীসের নিয়তিবোধ, শক্তির সমতা।

মাধবীর প্রতি □ বিনোদ বেরা

ধানের ক্ষেতের হাওয়া প্রচুর লাবণ্য দেয় মনে—
মাধবী, গাঁয়ের মেয়ে প্রাণরসে তুমি হে চঞ্চলা,
আমার জীবন বাঁধো একবার নিবিড় বন্ধনে
একবার হতে দাও রোমাঞ্চিত পূর্ণ ষোলকলা।

বালক-নিস্যন্দী প্রেমে আত্মহারা ভোলা ও হৃদয়
মসৃণ হলুদ ওই উজ্জ্বল ভোরের চাঁপা আলো
রক্তের আঁধারে যেন তৃষ্ণার মতন ঘন হয়,
মাধবী, গাঁয়ের মেয়ে একবার হতে দাও ভালো।

নিজের বাগান থেকে সপেদা জামরুল আনারস
ইত্যাদি অনেক ফল একদিন এনে দিয়েছিলে—
সে কথা মনে কি পড়ে—খুব মনে পড়ে সেই কথা।

একবার হে মাধবী হতে দাও আনন্দে অবশ,
ডাকো কমনীয় কণ্ঠে একবার বিস্তীর্ণ সুনীলে—
মাধবী, গাঁয়ের মেয়ে আমি চাই তোমার সখ্যতা।

অমল হওয়া ৬ □ ঈশ্বর ত্রিপাঠী

'নয়ন সমুখে তুমি নাই/নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

কি মনে পড়ছে তোমার ভাঙা চাঁদের মত পুট এবং
বিশল্যকরণীর মত বাহু
অগ্নি নরম ছিল বুঝি বিশল্যকরণী যাতে শক্তিশেল নিরাময় করা যায়
আর বালিকার মত অপুষ্ট স্তন মিথ্যা ঢাকা দেওয়া সবুজ ব্লাউস
কান-ফুল ছাড়া কোনো গহনা পরোনি .
শঙ্খবলয়ে আমারই কিনে দেওয়া লাল পলা
ওতে রক্ত লেগে আছে তুমি ছাখো আমার হৃৎপিণ্ডের টাটকা খর্খরে রক্ত
পাতলা ভীষণ পাতলা ফুরফুরে ঠোঁট যেন বাতাসে এক্ষুণি উড়াল দেবে
পায়রার মত
কার্লিং করা চুল অদীঘল রোগাটে মুখ চোখের সঙ্গে
অপরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে
তোমাকে কেউ কামনা করবে না, কোন পুরুষ
একা আমি আমার অন্তর্গত একজন কিশোর ছাড়া
যখন বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভা ছিল তোমার লাবণ্যে সন্ধিতে সন্ধিতে
মৃত সঞ্জীবনীর ভেল্কি
স্তন আরো উন্নত ছিল গাল মাংসল এবং চুল চুলের আইডল ছিল
তুমি আমাকে গোড়ালির আশ্রয় দাওনি
উপুড় হয়ে প্রণাম খাটতে
চোঁওনি একবারও ভুল করে শুধু দূরে থাকতে
শুধু ইচ্ছের চাবুক মারতে
দু' হাত দিয়ে পিষে ফেলার
সোনারঙ ধান বা গমের দানার মত ডালিম বীজের মত টইটুম্বুর
মন কেমন করা গন্ধে গন্ধে

তোমার কাছে আজও তেম্নি লোভী বালক এই ছত্রিশেও
যখন তুমি সৌন্দর্যের ইতিহাস হয়ে উঠেছ
আগুন নিভে দু' চারটে ফুলকি শুধু ছাই চাপা রয়েছে
তোমার নহবৎখানা এবং খাস দরবারে
মনে পড়ছে শুধু মনে পড়ছে মমিদের গল্প
খেজুর পাতার নূপুর বাজানো নীল নদীর সিঁড়িতে সিঁড়িতে
তুমি এই রকম ছিলে, আজ কেমন হয়ে গেছ, প্রেমিকা থেকে
উত্তরণ ঘটেছে সুশীতল মাতৃত্বে
এখনো আমি লোলুপ কিংবা যদি বলতে চাও বলো তৃষ্ণাকাতর
জল দাও আমাকে জল দাও তোমাকে ছুঁয়ে জাগাতে দাও
আমার মৃত আগ্নেয়গিরি
সেই বয়স এবং দিনগুলো ষোল আঠারো বাইশ
ছটফটানি ও ক্লান্তিহীনতা
এক পলকের দেখতে পাওয়ায় যাবতীয় দেবভোগ্য ঘৃতাচীদের রমণ
বিষ পিঁপড়ের কামড় শিরায় শিরায়
পায়ের তলায় সমাজ সংসারের কলরব
কানাকানি আমাদের ঘিরে গা মাজতে মাজতে
পদ্মসন্নিভ গোপাঙ্গনার
এম্নি সুরম্য স্মৃতিগুলি আমাকে ছেয়ে থাকুক বটচ্ছায়ার মত
তোমার আঙুল
যখের মত তুমি আগলে রেখেছ আমার ধনরত্ন
সেই তাপে গলে গেছে পুড়ে গেছে তোমার সুষমা
এখন ঐ পূত ভস্মরাশি ফিরিয়ে দাও আমাকে
এই জন্মে দ্বিতীয়বার আমি জেগে উঠি
হাত পা ছুঁড়ে দেয়ালা করি তোমার কোলে
ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে পুনর্বার ঘুমোই।

পলাতক সময় □ কিরণশংকর মৈত্র

রূপা, তোমার কুমকুম টিপের পাশে
কপালের লম্বা কাটা দাগটায়
আঙুলগুলি ওষ্ঠ হতে চায়,
যখন কাঞ্জীভরম শাড়ীতে মোড়া নরম শরীরে জ্বলে
অন্ধ্রের শ্যামলী আলো
তখন সুন্দরী এক নিরর্থক মন-ভোলানো মিথ্যে শব্দ
এবং আমার ভাণ্ডারের সকল উপমা নিঃশেষিত।

খ্যাতনামা তোমার স্বামী সফল সাংবাদিক পদ্মশ্রী
তুমি আপন প্রতিভায় স্বক্ষেত্রে উজ্জ্বল,
তোমার প্রশস্ত কোয়ার্টারে খেলা করে শোভন সন্তান দু'টি,
পরিপূর্ণ জগতের সীমানায় অদৃশ্য বৃদ্ধ প্রহরী!

তুমি জান না, কোনদিন জানবেও না
কী অলৌকিক দীপ্তি তোমার কথায়—অস্ফুট হাসিতে,
আমি নামহীন আর্তিতে শুধু সরু বাদামী ফিতেয়
অন্তহীন ধরে রাখি কথার মুহূর্তগুলি।

এমন মূর্খ কথা কি কখনও বলা যায়
তোমাকে·········ভীষণ·········!
বরং বলি—
এখনই যাবেন? আরেকটু বসুন না, প্লীজ—
হ্যাভ আ কাপ অফ কফি!

কিশোরী □ সুবো আচার্য

আঃ জীবন, বিস্ময়কর, রক্তঝরা, গোলাপপ্রতিমা
এই কিশোরীকে কেন আনলে আমার দেহের এত কাছে !
খোলা পা এবং ঈষত উরুতে নোতুন মাংসের সোনা,
চোখ ঝকঝকে, ঠোঁটে হাল্কা রক্তাভা,
যেন কোন অনাবিষ্কৃত পাহাড়ের এই ছোট্ট ঝরণা এই মেয়ে

রূপ ছেনে প্রগাঢ় কিশোরী তুই উঠে এলি
তোর কোনো দুঃখ নেই, তুই লঘু পাখির মতো
বাতাস ও মেঘ সাঁতরে এলি আমার আত্মার কাছে
আমি মাংস ঘেঁটে আকণ্ঠ ঘৃণায় বেদনায় অস্বস্তিতে
কান্নামেশানো গম্ভীর চীৎকার করে উঠেছি
আমার হৃদয় এই পৃথিবীর ভালোবাসা বিরহমিলন অন্তঃস্থল
ছিঁড়ে দেখেছে আথাল পাথাল করে শুধুই শূন্যতা
রক্তবর্ণ ব্যর্থতা, বীভৎস ব্যর্থতা, সামনে দেয়াল,
আমি বন্দী,
আমি ভিখারীর পিছনে যাওয়া শয়তান, আমি হত্যাকারী,
আমি নির্জন রাস্তার প্রেত, আমি অনুবাদকের ব্যর্থতা,
আমি তোর মৌলিক শরীরের কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে আছি

আঃ কিশোরী তোর গভীর খনিতে কী আছে বল ?

কাজল □ কুশল মিত্র

যতক্ষণ চোখ নামিয়ে চুল বাঁধবে তুমি ততক্ষণই
তোমায় গল্প বলবো, কাজল
কোন এক সাধারণ যুবকের যে তার সব কথা
শুধু তোমাকেই বলতে পারত

আমার গল্পের নায়ক সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠে আসবে
তোমার কাছে,
দিগন্তের সিঁড়িতে তখন গো-ক্ষুরে উড়বে ধুলো।

যদি আরো কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে চুল বাঁধো তুমি কাজল
আমি বসে থাকবো তোমার পায়ের কাছে—
আমার গভীর থেকে তোমার মনের মানুষ
উঠে আসবে চুপে চুপে,
আমার গল্পের নায়ক ফিরে আসবে
পৃথিবীর খোলা মাঠ থেকে তোমার সিঁড়ির কাছে।

যতক্ষণ নিচু মুখ, চোখ নামিয়ে চুল বাঁধবে, কাজল
ততক্ষণই আমি গল্প বলবো তোমায়
তুমি মুখ তুললেই আমায় যে চলে যেতে হবে।

এখন আমায় চলে যেতে হবে
কেন না, তুমি মুখ তুললেই দেখি তোমার কাজল নেই চোখে
আমার গল্পের নায়কও সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
নীচে নেমে গেছে অনেক গভীরে, তীব্র অন্ধকারে।
আর আমার চোখে মুখে
সবটুকু পথ ভেসে গেছে বন্যা বেদনায়
তোমার শিথিল কবরীর কেশ—এলায়িত মাঠ—
মাঠ কাজল-অন্ধকারে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী □ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

হাঁটু পর্যন্ত যায়নি চুল কাজল কালো মেয়ের
হাসলে টোল পড়ে না, গজদাঁত যায় না দেখা
চোখ নামিয়ে কথা বলে স্বভাব লাজুক
আনমনে ঠোঁট কামড়ানো তার মুদ্রাদোষ

উচ্চতা দেখিনি মেপে, শুধু জানি
সোজা দাঁড়ালো আমার বুকের মধ্যে মুখ
ভাঙা বাড়ীর বারান্দায় বছরের সাতশো দিনই
তার দেখা পাই স্বপ্নে, দেখি জাগরণে

এই হলো পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর বর্ণনা
কারণ তাকে এ রকমই দেখতে।

সে নারী □ কমল চক্রবর্তী

এবার বর্ষা শেষে পৃথিবীর নাম বদলে দেব
তোমার কেতাবী নাম রাখা যেতে পারে, রাখা যায়, চিবুকের ঢল
পরিষ্কার কোমরের খাঁজে চুমু খাই। সেই আশীর্বাদ
সেই নদী অন্য কারো বুকে নেই
অন্য কারো চুল নয় এত কালো, যেন অভিশাপ
যেন প্রবঞ্চিত হরিণেরা অশ্রু ফেলে গড়েছে নয়ন
দেবতার হাসি দিয়ে তৈরী জঘন, তাও জানি
অসংখ্য নারীর ঈর্ষা তোমার উরুর কালো তিল
বহু জয়, বহু উচ্চাশা, মোষের ক্রোধের মত গ্রীবা
বারো কোটী লোক মারা গেলে, তার বেদনার মসৃণতা
তোমার শরীরে, তোমার নাভিতে অমরতা।

সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত কামে এঁকেছ ভ্রূনব
অধর আত্মার মত গাঢ়
নারীর অভিমানে তুমি চুল ঝাড়ো, কেন বিলাসিনী
এবার বর্ষা শেষে এ গ্রহের বাসিন্দারা মুক্তি পাবে
সৃষ্টির প্রথম রাতে, তুমি সূর্যের তৃতীয় ভুবন,
তুমি আছো এই অজুহাতে স্বর্গের তোরণ খুলে দাও।

কিশোরীর ফুল □ দেবারতি মিত্র

এত স্বল্পবাসা কিশোরীরা রাস্তায় এসেছে
তা কি করে সম্ভব ?
সামনের দিকে ঘুম-ফ্রকের বোতাম খোলা
দেখা যাচ্ছে সবে ফোটা ফুল
হাওয়ায় ভাসছে খুব ফুরফুরে ঠাণ্ডা
আতপ্ত কাঞ্চনরঙা ছোট্ট হাল্কা স্তন
ফুটকি ফুটকি কত সংখ্যাহীন আবছা হলুদকুচি মৃত্যু

অতসী গাছের চেয়ে কিছু বড়
একটি লাজুক গাছ হাতছানি দিয়ে ডাকে—
গোছা গোছা পাতাসুদ্ধ শাখাগুলি পাগলী কিশোরী
নতুন উজ্জ্বল স্তন উঁচু উঁচু ফিকে টিউ ফুল।
ক'টি স্তন ক'টি বা কিশোরী
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়·········
গোনার আগেই
খেয়ালী ন' নম্বর দক্ষিণপূব দিকে নিয়ে চলে গেল।

কার মুঠো খুলে পাওয়া □ ব্রততী ঘোষরায়

সহজ অরণ্যে খেলা করে,
নারী, তুই অপরূপ শব্দের শরীর
কার মুঠো খুলে পেলি ?
চমকানো তরল প্রহর ?

সেই তো সহজ খেলা,
সহজ বলেই কত সহজে কঠিন হয়ে যায়
আলগা মুঠোর জাদু সহজেই কঠিন প্রবল

সেই তো আশ্চর্য খেলা, অলৌকিক প্রায়—
একবিন্দু নদীরেখা নারী হয়ে যায়।
সহজেই নদী এক নারী হয়ে যায়।

আহা! অবাক প্রতিমা তুই!
কার মুঠো ভেঙে পাওয়া ঝলকানো সোনা,
শব্দের মিছিল নারী কার বুকে ছুঁড়ে দিলি?

দীপাকে লেখা একটি চিঠি □ মিনতি গোস্বামী

দীপা কেমন আছো, কেমন আছো দীপালি রায়?
আমি জানি দীপা, তুমি বাঁচতে এসেছিলে বাঁচতে চেয়েছিলে বাঁচাতেও

সেইসব বর্বর দস্যুদের কালো বুটের হিংস্র আওয়াজ
আজও শোনা যায়
তোমাদের গ্রামে তোমার সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবীদের ঘরে
বাক্স প্যাঁটরা কাগজপত্তর এলোমেলো করে দেয় ঘর গেরস্থালী।
দেড়শ বছরের পুরোনো চুন বালি খসা তোমাদের দালানটা
আজও দাঁড়িয়ে আছে।
তোমার পেনসনভোগী বুড়ো বাবা ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ-হাতে
আজও তাকিয়ে থাকেন উদাস দৃষ্টিতে,
তোমার মাঝবয়সী মা রান্নাঘরে হাপরের আগুনে পুড়ে
চুলগুলো পাকাচ্ছেন
আর তোমার পরের সেই ছোট্ট বোনটা—এখন স্কুলে পড়ে।

জানি দীপা, তুমি চিঠি লিখতে সপ্তাহের শেষে একটা দু'টো,
কখনো অনেকগুলো রঙীন খাম আসতো
তুমি তাদের নিয়ে চলে যেতে চিলেকোঠায়
যার জানলা থেকে দেখা যায় দখিন মাঠের ঘাস জমিটা।

তোমার লাগানো শ্বেতকরবীর গাছটায় আজও ফুল ধরে
তোমার পোষা কুকুরটা চেনবাঁধা অবস্থায় আজও পাহারা দেয়।
তোমার অলকদা আর মণি বৌদি আজও ফুল পাঠায় তোমার জন্মদিনে

জানি দীপা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
দোষ—আইন অমান্য,
প্রকাশ্য চৌরাস্তায় তোমাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছিল
দোষ—খাদ্য আন্দোলন,
তোমার বিকৃত লাশটা তুলে দেওয়া হয়নি আত্মীয় স্বজনদের হাতে
দোষ—বাঁচার আন্দোলন।
আরও,
তোমার দেহটা আধপোড়া করে উপহার দেওয়া হয়েছিল
শেয়াল শকুনিদের।
হ্যাঁ দীপা, আর একটা কথা—
তোমার সেই প্রেমিক বন্ধুটি প্রতি সন্ধ্যায়……
আজও তোমার বেদীতে ধূপ জ্বালায়।
আর আমি, আমরা—আমাদের সমাজ
ইতিহাসের পাতায় ছেড়ে রেখেছি একটা লাইন শুধু তোমার জন্য।

এখানেই শেষ করি?

পুনশ্চ :—
কিন্তু তুমি জেনো দীপা, তোমার মৃত্যু নেই :
ইথার তরঙ্গ তোমার আদর্শ আর বাণীগুলো পৌঁছে দেবে
যুগযুগান্ত ধরে সংগ্রামী মানুষের কাছে ॥

তোতনের জন্য পদ্যমালা □ অভিজিৎ ঘোষ

১

এ রমণীর সুনাম শুনেছি ; ভুরু দুটির মাঝখানে
চোখ আলোকরা টিপ সে পরেনি—তবু
কপোলে ও ঠোঁটে মেখেছে লজ্জার আভা
কটাক্ষে বিদ্যুৎ নেই, আছে স্নিগ্ধ ছায়া :
যা জুড়ায় দগ্ধ এ প্রাণ—
যেন রবিশংকরের নিপুণ সেতার

আমার মঙ্গল ভাবনায় তার দিন যায়
পিতার ভবনের সুখস্মৃতিগুলি অঙ্গে জড়ায়
সিঁথির সিঁদুরেও সে খুব চমৎকার বলেছে
দীর্ঘ জীবন আর সন্তান সন্ততি নিয়ে সে থাকবে সুখে
দুঃখকেও ভাগ করে নেবে
সে আমার ধর্মের সঙ্গিনী
নাম রত্নাবলী—এ রমণীর সুনাম শুনেছি আমি

২

এলোচুলে নারী এসে বসেছে দর্পণের সামনে ; একা বলছে ঃ
দর্পণ, তুমিই বলো, আমি সাজলে সে খুব খুশি হবে কি না……
কপালে পরেছি টিপ, সিঁথিতে সিঁন্দুর ; এই সবুজ তাঁতের শাড়ীটি
আমাকে মানাবে তো ?—তুমি বলো

ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে এসে সে দেখবে—সন্ধ্যার প্রদীপ
জ্বলছে লক্ষ্মীর পটে, ধুনোর মদির গন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত
চা ও জলখাবার হাতে আমি যখন কাছে যাবো
সে কি খুশি হবে ?
দর্পণ, বলো বলো, সে খুশি হবে ?

কতদিন বৃথা কেটে গেছে—দিবস রজনী ;
ছেলেবেলায় ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বাইরে আসতো
যে স্বপ্নের রাজপুত্র—তার সঙ্গে দেখা হলো না আমার ;
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে বসে থাকতেন যে মহর্ষি
তিনিও দিলেন না দেখা—কতদিন স্বপ্নে পাখা মেলে
উড়ে গেছি দূর দূরান্তরে
যদি পাই, ঈপ্সিত পুরুষের দেখা পেয়ে যাই।
কিন্তু হায় ! সে যে এই অভিজিৎ নক্ষত্রেই ছিল
আমি বুঝতে পারি নি ;
নিজস্ব আলোয় সে আজ আমাকেও করেছে উজ্জ্বল
দিবস রজনী আর ভালোবাসাবাসি
শব্দের মানে আমি সঠিক বুঝেছি……

৪

দুঃখের ছায়ায় ঘেরা অন্ধকার বনে ছিলাম বেশ কিছুদিন
সুশীতল হাওয়া নেই, চাঁদ নক্ষত্র এবং নীহারিকা নেই
আমাকে থাকতো ঘিরে বিষাদ ও হতাশা
একদিন ঝড় এলো—বদলে গেলো জীবন ও প্রকৃতি
রমনীর ছদ্মবেশে আশা এসে দেখিয়ে দিলো
কোন্ পথে গেলে পাবো নতুন জীবন
আমি অন্ধ এগোই—
রত্নাবলী এসে ধরল হাত—চোখ খুলে গেল
চেয়ে দেখি এ-কি ? এ যে সোনালী প্রভাত……

৫

সাংসারিক কাজে কেটে গেছে সারাবেলা ; সন্ধ্যে হয়ে এলো
যাই এবার পড়ার টেবিলখানি যত্নে গুছিয়ে রাখি
স্নান সেরে এসে পরবে এই গেঞ্জি, কমলা পাজামা

আর কি রইল বাকি? কড়াইশুঁটির সিঙাড়া করেছি,
বাদামভাজা, ডালপুরী, নতুন কাপেতে আজ কফি করে দেবো

যাই, এইবার সাজাই নিজেকে
আমাকে সুন্দর দেখতে সে খু-উ-ব ভালোবাসে
বাটিকের শাড়ী পরবো—খোঁপা নয়, বিনুনী দোলাবো

এই বুঝি এসে পড়ল—
প্রতীক্ষার বেলা আমার আর যে কাটে না……

আমাদের রঞ্জনাদি □ সুজিত সরকার

আমাদের রঞ্জনাদি বোবা, কোনো কথা বলতে পারেন না।
তিনি শুধু হাসেন, যে হাসিতে কোনো শব্দ হয় না
আর আমাদের,
মানে তাঁর ভাই ও বোনেদের মঙ্গল কামনা করেন।

আমাদের রঞ্জনাদি বধির, কোন কথা শুনতে পান না।
কত অজস্র সঙ্গীত আমাদের যৌবন ঋদ্ধ করে যায়,
সেই সব সঙ্গীত রঞ্জনাদি শোনেননি কোনদিন।

আমাদের ছোট বোনেদেরও একদিন বিয়ে হয়ে যায়,
আইবুড়ো রঞ্জনাদি হাসেন,
তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন কামনা করেন,
দু-একটি রূপোলি চুল তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে
স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলি, অনুভূতিগুলি
কত ভুল ভাষায় আমরা প্রকাশ করেছি

রঞ্জনাদি সমস্ত জীবন কোনো কথা বলতে পারেন নি
তাঁর জীবনে প্রতিটি সুখ দুঃখে তিনি স্তব্ধ হয়ে থেকেছেন
আমরা রঞ্জনাদির চোখে জল
দেখতে পাইনি কোনদিন ॥

ভিক্‌টোরিয়ায় নীলাঞ্জনা □ নন্দদুলাল আচার্য

স্তন খুলে দিলে কোন পুরুষের হাতের মুঠোয়
ভিক্টোরিয়ায় নীলাঞ্জনা ;
তোমার আকাশে কুলিশ উধাও।
তোমার মৃদুল ঘাসের গোপনে,
ধ্বস্ত স্নায়ু কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?
ক্ষুধিতা জননী অভিশাপ দাও।

নির্বাচন □ মিহিরকুমার সেন

ভেবে দেখেছ ত মল্লিকা
বাংলা দেশের পল্লী, না,
ব্যস্ত শহর কলকাতা ?

ভাঙা উঠোনের তুলসীতলায়
প্রদীপ জ্বালানো সন্ধ্যাবেলায়,
অথবা, বিকেলে দুইজনে মিলে
ক্যাডিল্যাক চড়ে হাওয়া খেয়ে এলে—
কোনটা তোমার পছন্দ ?

উদার আকাশ খোলা মাঠ, আর
হাওয়া ঝিরঝির হেমন্ত ;
নয়ত গ্রাণ্ড-এ প্রখর আলোয়
প্রতি ধমনীতে রমণী হতে চাও ?

বলো, মল্লিকা ?
বাঁশবনঘেরা পল্লী, না ?
ব্যস্ত শহর কলকাতা ?

সেদিন তোমার দিদির বিয়ে □ অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

সেদিন তোমার দিদির বিয়ে, হনহনিয়ে এ-ঘর ও-ঘর
করছিলে বেশ, লাট্টু যেন বনবনিয়ে ঘুরছে কেবল।

শীতল বাতাস তোমার চুলে পিঠের ওপর ফুঁসিয়ে গেল—
সফেন নদীর মতন রুখু চুলেও তোমার কি মহিমা !
সবুজ শাড়ির আল্‌তো হাওয়ায় কাঁপলো বুকের ভেতরখানা—
তোমার চোখের মদির নেশায় আমার হৃদয় পাগল হল !

আলতা-রাঙা পা ছু'খানি ছাপ ফেলেছে মেঝের ওপর
ছুইখানি হাত কোমল-পেলব হলুদ রঙের স্পর্শে রাঙা—
রুমা, তোমার কপাল জুড়ে নীল টিপ, লাল নরম ঠোঁটের
মধুর ভাষণ বিঁধছে বুকে ভীষণভাবে কাঁটার মতন !

আমায় দেখে মুচকি হেসে ধবল দাঁতের মদ ছড়ালে
বুকের ভেতর গর্জালে মেঘ, মেঘের মতন থমকে গিয়ে
ধূমল ধূসর করলে স্মৃতি, সেই প্রীতি কি পড়লো মনে
রাত্রি জুড়ে চোখ জ্বেলেছো, বুক জ্বেলেছো নিবিড় প্রেমে।

রুমা, গলায় সেই মণিহার আমার জীবন আগলে রেখে
সোনার ছুলে দোছুল চুলে নেশার মতন বাঁধলো কেন ?
হাতের চুড়ির ঝন্‌ঝনানি আনলো বুকে দম্‌কা প্রলয়—
পড়লো মনে অতীত দিনের রাস্তা হাঁটা, কলেজ মাঠে
বটের তলায় ছুজন প্রাণী রাত কেটে দিন করছে বুঝি,
সেই আশ্রম রুদ্ধ ছুয়ার, টাইপ স্কুলের মুখস্থ পথ,
শীতের রাতে হাত মিলিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

ঘরের দেয়াল কাঁপছে, পরীর মতন ডানার নরম আদর
এই দিনে নেই, তোমায় দেখে দুললো নদী, ফুললো আকাশ।
শাঁখের আওয়াজ বাজলো কানে, তোমার বুকের বাগান জুড়ে
সুগন্ধময় ফুলের ঘ্রাণে ঝরলো মধু, গাইলো ভ্রমর।

তোমার দিদির বিয়ের দিনে বরের সাজে এলেই বুঝি
ভালো হতো ঃ বোধ হয় তুমি তেমন সাজেই সেজেছিলে !

কোলকাতার কবিতা সেন □ অভিজিৎ পাত্র

আমার প্রেমিকা কোলকাতার কবিতা সেন
এখন যার হাজারো প্রেমিক, হাজারো রাতে
শ্যাম্পেনের নেশার ঘোরে, স্বপনের জাল বুনে
আয়ত চোখের বাঁকে বয়সের কালি পড়ে
এমনি এক নষ্ট মেয়েমানুষ।

ভালোবেসে সুদর্শনা শরীর দিয়েছিল,
হাজারো আকাঙ্ক্ষার মিষ্টি সুস্বাদ
নিরঙ্কুশ অন্ধকার সিঁড়িটির উপর ঘনিষ্ঠ সময় ধরে
বিশ বসন্ত রক্তের ভিতর ভালোবাসার মিছিল চলছিলো।

সেই রোমাঞ্চকর কলরবহীন সত্তরের মিছিলের নেত্রী ছিলেন
আমার প্রেমিকা কোলকাতার কবিতা সেন।

জলপাত্র হাতে সন্ন্যাসিনী □ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়

'সুরঞ্জন, জল খাবি বাবা ?'

আহত পুরুষ, জনতার ভিড়, কণ্ঠস্বরে মমতার ঝর্ণা নিয়ে
কে এল ঐ সন্ন্যাসিনী—সিস্টার 'আপি' 'আপি' !

নীল পাড় ডোরাটানা, সাদা শাড়ী, মমতাজ্যোৎস্না মাখা মুখখানি ঘিরে
নিরাভরণ হাতে ছুঁয়ে যায় আবৃত কপাল।
সুরঞ্জন, চেতনার পারে চোখ মেলে দেখে চিরন্তনী মাকে।

'আপি' তুমি সবার আপনজন আমারও জননী।
প্রিয়তমা সন্ন্যাসিনী আমার, কিছুই ভোলনি তুমি
বলয় কিংবা কল্কার অবস্থান ঠিকঠাক কাশ্মিরী শালে ফুল তুলে দাও
এখনো আনমনা হও দক্ষিণী সঙ্গীতে
কখনো গীর্জার শৈত্যে গান কর বিগলিত বেদনায়,
নিষেধের বেড়া ভেঙে যে আসে সে প্রেম—চিরপ্রিয় যীশুর প্রেমে
স্নাত তুমি,
মর্ত্যের মাটির প্রদীপ যেন তুমি—ঐ শুদ্ধ দেহ যৌবনে নিবিড় স্থির শান্ত।
মিথ্যার আঁধার তুমি ছিন্ন কর সহজেই
তোমার দিব্য দুই হাত সূর্যকর, পুণ্যতোয়া সরসীর জল পা দুখানি
শ্বেতহংসী হেঁটে যাও ম্রিয়মান আকাশের নীল পটে
দু'চোখে প্রার্থনার মোম, উজ্জ্বল দাঁতের সারিতে হাসিটুকু শান্তিময়
থাকে চিরক্ষণ দুঃখে ও সুখে,
ফুল ভালোবাসো, শিশুর মুখের কাছে মুখ রেখে খুঁজে পাও স্বর্গীয় সময়।

নারী তুমি, তবু নারী নও!
দেবীর চোখে কি জল আসে? পুরুষের চোখ যখন তোমাকে দেখে
দূর থেকে—তখনও তুমি শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী।
আঙিনা জুড়ে বিশ্বজুড়ে পড়ে আছে যত সব আহত মানুষ
মমতার স্বর মৃত্যুকে অতিক্রম করে, বলে—
'সুরঞ্জন, জল খাবি বাবা?'

তৃষার্ত মানুষের ভিড় বেড়ে গেছে আদিগন্তে আজ
আপি তাই চলে যায়, জলপাত্র হাতে, আমার দুয়ার হতে অচেনা দুয়ারে॥

প্রেম □ রতনতনু ঘাটী

একদিন হলদিয়ার দিক থেকে নীল আকাশ ভেঙে
রাজহংসীর মতো উড়তে উড়তে মহিষাদলে এলে তুমি,
আমি হাঁসটাঁস বা ঐ জাতীয় কিছু একটা ভেবেছিলাম
কিন্তু তোমাকে ভাবিনি।

তারপর একদিন ফাঁকা রেললাইনে একা পেয়ে
খুব নীচু স্বরে তোমাকে 'হংসবালিকা' বলে ডেকেছিলুম,
সেই থেকে কেমন করে যেন
তোমার হংসবালিকা নাম রটে গেল পাড়ায় পাড়ায়।

সেই থেকে রোজ বিকেলে ভূমধ্যসাগরের দিকে মুখ করে
তোমাদের বাগানে বেতের চেয়ার নিয়ে তুমি বসতে
সোনার কাঁকনের মতো চাঁদে আমার কবিতা খুঁজতে।
পড়শীরা এসব বুঝতো না, বলতো—
'ঐ তো কবির গ্রাম বসে আছে, যেন নদী রূপনারায়ণ'—
এ কেমন রটনা বলো তো!

আর আমি আমার খ্যাতিহীন কবিত্ব, চন্দনপিঁড়ির মতো
আমার বুড়ো বাবা-মা আমার অভাব অনটনের সমাজকে
একপাশে সরিয়ে রেখে
চুপি চুপি বাগানে ঠিক তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম
তুমি বিয়ের মন্ত্রের মতো মুখ তুলে বলতে—
'কই কিছু বলো।'
আমি তোমার কার্পাস-হংসের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে বলতুম-
'তুমি? তুমি আমার ভারতবর্ষ!'

বিধবা দিদি □ নির্মল হালদার

তার আঙুলে লেগে থাকে ময়দার আঠা।
সে ঠোঙা করতে করতে ঠোঙাই করে
ঠোঙা ফাটার আওয়াজও শোনে না।
আমার দিদির এইটুকুই জীবন, জীবিকা।

কোনোদিন কাগজ কাটার ছুরি খুঁজতে গিয়ে
পুরনো টিনের মধ্যে দেখে ভাঙা আয়না।
মনে কি পড়ে না, আয়নাতে ছিল
তারও একটি মুখ
বিন্দু বিন্দু ঘামের সঙ্গে একটি সিঁদুর ফোঁটা।

আমি আপনাকে চিনি না □ সমীর রায়

আমি আপনাকে চিনি না
আপনার ভাই, কমরেডের কাছে শুনেছি, জেনেছি আপনার নাম
আমাদের জেলের পাশেই আপনাদের ফিমেল ওয়ার্ড
পেছন থেকে দেখেছি একদিন :
রোদ্দুরে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয়
তেমনি অস্বাভাবিক বিবর্ণ ফ্যাকাশে ঘাড়ের চামড়া।
আপনি অসুস্থ এখন—
রেক্টামে যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণ, মাথায় যন্ত্রণা
শিরাগুলো তরল লোহার স্রোতে এমনি পাগল,
বিটোফেন কাছে এলে গান ভুলে গিয়ে নাড়ী টিপতে বসবেন
ডাক্তার ডাকার জন্য এ-ঘর ও-ঘর করবেন আপনার জন্য।
আপনি এখন বাইরের হাসপাতালে
জানি না কেমন আছেন, কেমন থাকবেন ;
আজকাল হাসপাতালগুলো আমাদের জেলের
ফাঁসির মঞ্চের পাশে ঘোরাফেরা করে।

তার উপর ঘাতকের বুটের শব্দ প্রদক্ষিণ করছে আপনাকে।
পৃথিবীকে দৃঢ়তার সামনে এগুতে দেখেছি—
কমরেড, বোন আমার
দৃঢ়তাকে দাঁতের মাড়ির পাশে ডেকে এনে দেখো
আমাদের শক্তির ভারে পৃথিবী গর্ভবতী
ঘাতকের পাশে পাখি ডেকে কথা বলে মানুষের সাথে।

ইদানীং বনলতা সেন □ জয়ন্ত দত্ত

কোলকাতার রাস্তায় ইদানীং
বনলতা সেন বেলবটস্ পরিহিতা
ইতস্ততঃ প্রেমিকা
কয়েকজন যুবকের সাথে পরস্পর, একা একা
নাগরদোলায়
ঘুরে যায় বন্‌বন্
দার্শনিক শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ
দীর্ঘদিন পরলোকে ঈশ্বর হয়েছেন।

শোভনাকে □ বিদ্যুৎ ভৌমিক

আমি সত্তরের যীশু ঃ

সোনালি রোদ্দুরের মতো তুমি উঠোন জুড়ে খেলো, সকাল থেকেই
রান্নাঘরময় কেমন তুমি ধানাই পানাই। চায়ের জল চাপাও
হাত পুড়িয়ে। বাজার ছুটতে হয় সাত সকালেই, আর বাজার
গেলেই মাথায় হাত। দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে। সুখী জীবন
তিরোহিত। আমাদের চুমোর মধ্যে দুর্ভিক্ষের কান্না।

আমার অফিস ১০টায়। এখন আর তাড়া নেই।
জরুরী অবস্থায় অফিসারগুলোর বড়ো বাড় বেড়েছিল। চুলোয় গ্যাছে।

তানিয়ার ইস্কুলের গাড়ি আসে সাড়ে ৯টায়। তানিয়া
তোমার আমার সৃষ্টির প্রথম ফসল।
তুমি কেমন বেহুঁশ হয়ে পড়ছো, তানিয়া কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে।
তানিয়া ইস্কুল গেলেই তুমি একা একা ঠায় বসে ভাবো
আকাশ কুসুম। কি ভাবো?

বুড়ির মা যে তোমার ফাইফরমাশ খাটে সেও এখন নেই।

আজ পেমেন্টের দিন। বেরুনোর আগে তুমি তানিয়ার হরলিকসের
কথা বলেছো। তানিয়া বাড়ী ফেরে ৩টায়। অফিস কোরে কফি-
হাউসে যাই। দেখা হয় অফিস-ফেরৎ প্রাক্তন প্রেমিকা
সুপর্ণার সাথে।

শোভনা, তুমি চেনো না সুপর্ণাকে, তোমাকে তো সুপর্ণার কথা
কখনও বলিনি, জানো না আমার গোপন ভালোবাসার কথা।
সুপর্ণা জিজ্ঞেস করে তোমার কথা, তানিয়ার কথা।

আমার বাড়ি ফিরতে রোজই ৭টা বাজে। প্রত্যহ তুমি
অর্থবিহীন স্বপ্ন দেখো। এইভাবে তুমি প্রতিনিয়ত মুটিয়ে যাচ্ছো,
স্বপ্নবিলাসী হোয়ে পড়ছো ক্রমশঃ ভয়ানক॥

সেই মেয়েটি □ গৌরীশংকর গাঙ্গুলী

সেই মেয়েটি হারিয়ে গেছে স্মৃতির ভিতর
স্মৃতির ভিতর বুকের ভিতর এবং মনে

দুই চোখে তার জড়িয়ে ছিল আদিম নেশা,
আদিম এবং আদিমতর—আদিমতম।
বুকের উপর উড়াল পুলে নেই কোন তান ছন্দবাহার
অপরাজিতা ফুলের মত নীল রঙা পাড় মেরুণ শাড়ী
দীঘল নাভির একটু নিচে জঙ্ঘা প্রদেশ

এবং সেথায় গুপ্ত ছিল গোপন কোন রসের ডিভান
সেই প্রদেশেই যুদ্ধ ক'রে হাজার যুবক শহীদ হোল

দুধ শাদা রঙ পায়ের পাতা আলতারাঙা
সেই মেয়েটিই হারিয়ে গেল বুকের ভিতর
বুকের ভিতর মনের ভিতর এবং স্মৃতি—

লকলকে জিভ সাপের মত হিসহিসিয়ে
চোখের ভিতর হাজার তারার আগুন ছিল—দীপ্তি ছিল,
সুধার নামে দু'হাত ভরে শুধুই গরল
সব ছিল তার বুকের ভিতর প্রেম ছিল না।
সেই মেয়েটিই হারিয়ে গেল মনের ভিতর
মনের ভিতর স্মৃতির ভিতর এবং বুকে—

প্রেম ছিল না এবং কোন ভালবাসা
তাই বুঝি সে এমনি করেই হারিয়ে গেল
রইল কেবল ছোট্ট তাহার এই পরিচয়
সেই মেয়েটির সবই ছিল হৃদয় ছাড়া।

কৃষ্ণা নামের সেই মেয়েটি অনেক দূরে
বর্ণ ছাড়া আর সবেতেই নামের মত।

বেশ তো লাগে □ প্রবাল কুমার বসু

ভিজে চুলেই ছিল রীণা, বেশ তো ছিল
কেন যে চুল খুলতে গেল
এখনই তার চুলটি খোলার সময় হল
এই মুহূর্তে আকাশ কালো
আকাশও বুঝি কালো মেয়ের চুল খুলছে
কার তাতে কী—
বেশ তো লাগে দেখতে রীণার চুলের ঝুটি ॥

সুরঞ্জনাকে হাসতে দেখিনি কোনোদিন □ চন্দন চৌধুরী

সুরঞ্জনাকে হাসতে দেখিনি কোনোদিন।

দশটা পাঁচটা অফিস
আইব্রো টেনে চোখের উপর বাঁকা কালো চাঁদ
গালের উপর টোল পড়ে অতি সহজেই
পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অভিমান নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে
থাকে বাঁপাশের নীল নির্জন তিলটা।

সুরঞ্জনাকে ভালোবাসতে বড্ড ইচ্ছে হয় সকলের ঃ
সুরঞ্জনার ব্যক্তিগত ডাইরীর কোন পাতাতেই
জানা কিংবা অজানা
কোনো পুরুষ বন্ধুর নাম নেই একটাও।
সেই দশটা পাঁচটা অফিস
রোববার ছুটিতে বিবাহিতা বান্ধবীর মেয়েটার জন্য
আনচান্,
বেশ সুখে আছে সুখেন্দুটা —
মাঝে মাঝে ভাবনাহীন নীরস চিঠির প্রত্যুত্তর।

রাত্রি গভীর হলে
সুরঞ্জনাও মিশে যায় অন্ধকারের অবয়বহীন কুয়াশায়
হাত নেই, পা নেই, না কোন চাঁদ, না সেই তিল
শুধু একটা হাসির তামাশা শুয়ে থাকে
সারা ঠোঁট জুড়ে সারারাত।

সুরঞ্জনাকে হাসতে দেখিনি কোনদিন ॥